আরও মুস্কিল আছে। আভিংয়ের মত নট-জ্যোতিক স্বকক্ষ ত্যাগ ক'রে অন্য রাজ্যে যদি কখনও গিয়ে পড়েন, তা'হলে তাঁর অস্বস্তির সীমা পরিসীমা থাকে না। আভিংয়ের নিজের জীবনেরই এক রাত্রির কথা বলি। কোন একটি সাহায্য অনুষ্ঠানের জন্যে একটি সম্মিলিত অভিনয়ের আয়োজন হয়। সে-সময়ের ভালো ভালো প্রত্যেক অভিনেতা-অভিনেত্রীই এই অভিনয়ে যোগ দিয়েছিলেন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই; কাজেই একটি সামান্য ভূমিকাতেও একজন বিশিষ্ট অভিনেতাকে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। অভিনেয় নাটক ছিল "The School for Scandal." আভিং অবশ্য এতে Joseph-এর ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সকলেই আশা করেছিল, কী চমৎকার অভিনয়ই না আভিং করবেন—আসর একেবারে মাৎ হয়ে যাবে!—সে-রাত্রের দর্শকদের কিন্তু যতখানি নৈরাশ্য ভোগ ক'রতে হয়েছিল, তার চেয়ে বড়ো নৈরাশ্য ভোগ তারা বোধ করি জীবনে দু'টি দিন করে নি; কারণ সে-রাত্রের থেকে নিকৃষ্টতর Joseph দেখবার দুর্ভাগ্য তাদের আর কোন দিনই হয়নি। আভিং ক্রমাগত লাফাচ্ছিলেন, আর ঝাঁপাচ্ছিলেন; তাঁর গতিভঙ্গীর করছিলেন পরিবর্ত্তন মুহুর্মুহুঃ। "Old Drury"-তে হাচ্ছল অভিনয়; অথচ তাঁর অর্দ্ধেক কথাই লোকে শুনতে পায়নি। সমবেত সকলেই স্পষ্ট বুঝতে পারলে, গৃহীত চরিত্র সম্বন্ধে আভিংয়ের মনে কোন একটা ধারণাই গঠিত হয়নি—তিনি মাত্র তাঁর চিরঅভ্যস্ত কতকগুলি প্যাঁচের সাহায্যে কোন মতে 'ছ'কড়ি সাতে'র খেলা বজায় রাখবার চেষ্টা করেছেন।

*

যিনিই প্রধান অভিনেতা, তিনিই অধ্যক্ষ হওয়ার অর্থাৎ actor-managership-এর আর একটি বিপদ আছে এবং আমাদের মতে, সেইটিই হচ্ছে সব থেকে বড়ো বিপদ। এবং এর জন্যেও আভিংকেই দৃষ্টান্ত ধরা যাক। সে-সময়ে থিয়েটার ক'রে আভিংয়ের চেয়ে বেশী টাকা রোজগার আর কেউই ক'রতে পারেননি। এক বছর তিনি প্রায় এক লক্ষ পাউণ্ড দর্শনী আদায় করেছিলেন নাট্যরসিকদের কাছ থেকে। তাঁর বাৎসরিক লাভ ছিল আট হাজার থেকে দশ হাজার পাউণ্ডের ভিতর। তবু মৃত্যুকালে তিনি একটি কপর্দ্দকও রেখে যেতে পারেননি—সঞ্চয় করবার তাঁর ক্ষমতা এবং উপায় ছিল না। প্রধান অভিনেতা-অধ্যক্ষের লাভ হচ্ছে এই। চার্লস্ কীন এবং অপরাপর অধ্যক্ষ-অভিনেতারও সমান অবস্থাই ঘটেছিল। আসল কথা, অভিনেতা এবং অধ্যক্ষ—এই দুইয়ের কাজ হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র এবং এ'দের মাঝে ঐক্যবন্ধন হ'তে পারে না; কোন দিনই সুষ্ঠুভাবে এই দু'টি কাজ এক ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। অভিনয় এবং অধ্যক্ষতা—দুইই হচ্ছে রীতিমত শক্ত পেশা এবং দুইয়ের জন্যেই থাকা চাই উপযুক্ত শিক্ষা, দক্ষতা এবং সবচেয়ে বেশী ক'রে জন্মগত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। অভিনেতা-অধ্যক্ষ কিন্তু সত্যি সত্যিই অধ্যক্ষতা করেন না; কারণ অধ্যক্ষতার অর্থ হচ্ছে, একটি সুচতুর জনসমষ্টিকে ঠিকমত আয়ত্তে রেখে পরিচালনা করা; নিজের অধীনস্থ প্রত্যেকটি লোকের বিশেষ ক্ষমতা ও প্রকৃতি বুঝে নিজের সুবিধা এবং লাভের দিকে লক্ষ্য রেখে তাকে উপযুক্ত কাজে লাগানো। কিন্তু অভিনেতার এ-সমস্ত দিকে নজর রাখবার আবশ্যকতা নেই; নিজেকে কি উপায়ে বেশী জনপ্রিয় ক'রে তুলতে পারা যায়, সেই চেষ্টাই তাকে ক'রতে হবে অহর্নিশি এবং নিজের জনপ্রিয়তাকে কত বেশী মাত্রায় কাজে লাগানো যেতে পারে, সেই দিকেই বরাবর তার লক্ষ্য থাকাই স্বাভাবিক। কারণ, সে জানে, যেদিন থেকে সে এই দুলভ জনপ্রিয়তাকে হারাতে বসবে, সেই দিন থেকেই তার ভাগ্যাকাশও একটু একটু ক'রে হ'তে থাকবে অমাচ্ছন্ন। কাজেই অভিনেতার যে-পথে চলা উচিত, অধ্যক্ষের পথ হচ্ছে তার থেকে ঠিক উল্টা দিকে এবং এ-দুয়ের মাঝে মিল হবে না কোন কালেই।

*

"কাজ্‌রী"র একখানি চমৎকার হস্ত-বিজ্ঞাপনী (hand-bill) আমাদের হাতে এসে পড়েছে। "কাজরীর প্রশংসা পঞ্চ-মুখে (?)"—এই সত্য প্রমাণিত করবার জন্যে পাঁচখানি সাপ্তাহিক থেকে পাঁচটি সুখ্যাতিমূলক বাক্য তুলে দেওয়া হয়েছে এবং তার নীচে বড় ক'রে লেখা হয়েছে—"—কিন্তু নাচঘর বলেন—এ্যামেচার 'সাজঘরের একটি রজনীর ইতিহাস' যে বীভৎস মূর্ত্তি নিয়ে—"ইত্যাদি। আমরা যদি "কাজ্‌রী"র হ্যাণ্ডবিল লেখবার ভার পেতুম, তা'হ'লে আমরা "নাচঘরে"র সঙ্গে মত মিলিয়ে আরও খানকয়েক কাগজের উক্তি উদ্ধার ক'রে দিতে পারতুম, এমন কি যে-পাঁচখানি কাগজের প্রশংসা-বাণী তাঁরা ছেপেছেন, তাদেরও মধ্যে থেকে অন্ততঃ দু'খানিকে আমরা দলে টানতে সক্ষম হতুম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, "নাচঘর" প্রশংসা করে কিংবা নিন্দাস্ত্রিবে জর্জ্জরিত ক'রে দেয়, তা' নিয়ে মস্তককে অতখানি ঘর্ম্মাক্ত করবার আবশ্যকতা কি? এবং ইচ্ছা ক'রলে "নাচঘর" থেকেও ত' প্রশংসাবাণী উদ্ধার করা কি খুব-বিশেষ কঠিন হ'ত? "অশোক"-নাট্যাভিনয়ের সময়ে "রঙ্‌মহল" ত তাই-ই করেছিলেন। "কাজ্‌রী" অভিনয় সম্পর্কে "নাচঘরে"র কোন্ মত্‌টি খুব লাগসৈ হয়, তা' আমরাই দেখিয়ে দিচ্ছি—"অভিনয়-হিসাবে বরং back-stage-এর দৃশ্যগুলি অনেকটা সার্থকতা লাভ করেছে"—এই লাইনের 'বরং' এবং 'অনেকটা'-এই দু'টি কথা বাদ দিলেই খুব-সুন্দর হ'ত এবং এর পরে আরও বড়ো ক'রে দেওয়া যেত—"অভিনয়ের দিক দিয়ে প্রথম মার্কা পাবেন" থেকে সুরু ক'রে প্রায় পুরো প্যারাটি।

*

কিন্তু "রঙ্‌মহল" তা' করেন নি। নিন্দাও যে সময়ে সময়ে প্রশংসার চেয়ে বড়ো বিজ্ঞাপনের কাজ করে, এ-তথ্যটি রঙ্‌মহল-কর্তৃপক্ষের জানা ছিল এবং এই অমূল্য জ্ঞানকে তাঁরা সুযোগ বুঝে কাজে লাগিয়েছেন। আমরা "রঙ্‌মহল"-কর্তৃপক্ষের ব্যবসাবুদ্ধির তারিফ করি সহস্রবার।

*

"নব-নাট্যমন্দির" অতি-শীঘ্রই "সরমা"-কে মঞ্চস্থ করবার জন্যে তুমুল তোড়জোড় লাগিয়ে দিয়েছেন। সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি বা অক্টোবরের গোড়াতেই "সরমা" নাট্যমোদীদের সামনে নিজের ঘোমটা খুলবে। আমরা নিশ্চয়ই আশা ক'রতে পারি, "বিরাজ বৌ"-এ আমরা যে-শিশিরকুমারকে অমানিশা অন্তে নবারুণরূপে দেখতে পেয়েছিলুম, "সরমা"-তে সেই শিশির-কুমার পুনরায় মধ্যাহ্নের প্রদীপ্ত ভাস্কর মূর্ত্তিতে দেখা দিয়ে বাঙলার নাট্যগগনকে করবেন জ্যোতিবিভাসিত।

চিত্রপুরী ঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

(রঞ্জন রুদ্র)

চিত্র পরিচয় ঃ তরুণী (কালী ফিল্ম্‌স্)

অভিনেতৃবৃন্দ :—রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় ; তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী ; জীবন গাঙ্গুলি ; ললিত মিত্র ; ভূমেন রায় ; জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ; শ্রীমতী ডলি ; জ্যোৎস্না ; রাণীবালা ; পদ্মরাণী।

পরিচালকবর্গ :—প্রযোজক—প্রিয়নাথ গাঙ্গুলি ; আলোকশিল্পী—ননী স্যান্ন্যাল ; শব্দযন্ত্রী—মধু শীল ; কথা ও কাহিনী—হেমেন্দ্রকুমার রায়।

ছবিখানি রূপবাণীতে দেখানো হচ্ছে।

*

"তরুণী"র গল্পটি হেমেন্দ্রবাবুর উপন্যাস "মণিকাঞ্চন" থেকে নেওয়া হয়েছে। গল্পটি সংক্ষেপে হচ্ছে এই—

হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় আনন্দ নামে এক ধনী যুবক গুণ্ডার হাতে আহত হয়ে জোড়াবাগান অঞ্চলে এক বাড়ীতে আশ্রয় প্রার্থনা করছিল। গৃহস্বামী কালাপাহাড় গুণ্ডার দলের সর্দ্দার। সেটা ছিল তারই বাড়ী। ওপর থেকে কর্কশ কণ্ঠে আনন্দকে তাড়না ক'রে সে তাকে হাঁকিয়ে দিলে। দরজা বন্ধ হ'য়ে গেল। নিরুপায় শ্রান্ত আনন্দ তখন নড়তে পারছে না। সে আবার ডাকাডাকি সুরু করলে। তখন সন্তর্পণে দরজা খুলে লণ্ঠন হাতে ক'রে বেরিয়ে এলো ত্রয়োদশীর ক্ষীণ শশীলেখার মতো একটি কিশোরী মেয়ে—দুই চোখে তার ভীরু সতর্কতার ছায়া। সে উমা। গরীব বাপ তার কালাপাহাড়ের ভাড়াটে। উমার সম্বন্ধে কালাপাহাড়ের কল্পনা যেমন জঘন্য তেমান নীচ।

*

উমা আনন্দকে আশ্রয় দিলে। সকাল বেলা কালাপাহাড় তাকে দেখে কটুকণ্ঠে গালাগাল দিয়ে আনন্দকে তাড়িয়ে দিলে। আনন্দ কিন্তু উমাকে ভুলতে পারলে না। পরদিন মায়ের অনুরোধে সে সেপাই-শান্ত্রী নিয়ে এসে উমাকে তার বাড়ী নিয়ে গেল।

কালাপাহাড় রাগে ফুলতে লাগ্‌লো।

কালাপাহাড়ের আড্ডাটি এক অভিনব নরক। সেখানে থাকে তাহার সহকারী রাজু ; মানকে ; এবং আরও অনেকে ; আর সেই সঙ্গে থাকে সত্য নামে এক নীচ জাতীয়া যুবতী আর তার মা। নিত্য নামে আর একটি প্রৌঢ়া বদ্-স্ত্রীলোকও সেখানে বাস করে।

*

কালাপাহাড় মানকে আর নিত্যর সাহায্যে উমাকে আনন্দর বাড়ী থেকে ধ'রে আনলে এবং তাকে দূরাঞ্চলে এক বাগানবাড়ীতে বন্ধ ক'রে রেখে দিলে। এবার সেখান থেকে অদ্ভুত কৌশলে তাকে উদ্ধার করলে আনন্দর পরম বন্ধু প্রণবকুমার। আনন্দ আর প্রণব একটি সমিতি স্থাপন করেছিল তার নাম 'তরুণ-সমিতি' ; জনহিতকর কাজকর্ম্মই ছিল তার উদ্দেশ্য। তাদের কাজে গীতা নামে একটি এম্-এ পাশ করা অতি-আধুনিক তরুণী যোগদান করেছিল এবং আনন্দের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল। আনন্দ কিন্তু তা বুঝতো না ; সে ভালোবেসেছিল উমাকে ; প্রণব এদিকে গীতাকে ভালোবাসতো ; কিন্তু গীতা সে প্রেমের প্রতিদান দিতে রাজী ছিল না।

গল্পটি এইদিক দিয়ে একটি বিভিন্ন এবং বিচিত্র গতিলাভ করেছে।

*

উমাকে উদ্ধার ক'রে আনন্দ তাকে নিয়ে ঝাঁঝা চলে গেল। কিন্তু সেখানেও সে নিস্তার পেলে না। কালাপাহাড় সদলবলে সেখানেও গিয়ে উপস্থিত হ'ল। ইতিমধ্যে প্রণব এবং গীতাও সেখানে গিয়েছিল।

কেমন ক'রে কী উত্তেজনার মধ্যে এই চিত্তাকর্ষক গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটল, তা ব'লে রসভঙ্গ নাই বা করলাম।

*

"তরুণী" ছবিখানি আগাগোড়া বিশেষ শ্রুতি-মধুর এবং উপভোগ্য হয়েছে। "শ্রুতি-মধুর" বল্লাম এই জন্যে যে এর শব্দযন্ত্র-সম্পর্কীয় কাজ হয়েছে একেবারে নিখুঁত ;—এত ভালো recording বাংলা ছবিতে শুনি নি বল্লেও অধিক বলা হয় না।

গল্পটি আগাগোড়া বেশ ভালো ভাবেই বলা হয়েছে ; আমাদের আপত্তি আছে শুধু এর শেষটুকু সম্বন্ধে।

গল্পের শেষের দিকে বিশেষ তাড়াতাড়ি ক'রে কাজ সারা হয়েছে ব'লে মনে হ'ল—ফলে প্রণব কর্ত্তৃক গীতা-উদ্ধার এবং কালাপাহাড় বধের ব্যাপারটি abrupt বলে মনে হয়েছে। "মণিকাঞ্চন" উপন্যাসখানি আমাদের পড়া আছে ; তার শেষের দিকে কালাপাহাড় এবং প্রণবের মধ্যে যে সংঘাত ও সংগ্রামের ছবি আছে, সিনেমার দিক থেকে তা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হ'ত বলেই আমাদের বিশ্বাস। ঐ স্থানে কর্ত্তৃপক্ষ উপন্যাসটিকে

হুবহু অনুসরণ করলে ছবিখানি যে আরও হৃদয়গ্রাহী হত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কালাপাহাড়কে হত্যা ক'রে তার জীবনের অবসান ঘটানোর মধ্যে সুলভ এবং অসঙ্গত ঘটনা সংস্থাপনের পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

*

আর ভালো লাগেনি "তরুণী"র নেপথ্যসঙ্গীত। কনসার্টের ধরণে যে মিউজিক শুনলাম তা মোটেই আমাদের আনন্দ দ্যায় নি। নেপথ্যসঙ্গীত আরও অনেক উন্নত শ্রেণীর হওয়া উচিৎ ছিল।

ছবিখানি অন্যদিকে এত ভালো হয়েছে যে তার সঙ্গে নেপথ্যসঙ্গীত হয়েছে অত্যন্ত বেমানান।

*

খুবই ভালো হয়েছে "তরুণী"র ফোটোগ্রাফী! আলোকশিল্পী আগাগোড়া তাঁর কাজ সুন্দরভাবে বজায় করেছেন। কোথাও বিশেষ কোন ত্রুটি তো চোখে পড়েই নি উপরন্তু স্থানে স্থানে আলোকশিল্পের উৎকর্ষ দেখে ননীবাবুকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করছিল। ছবির openingটি চমৎকার!

*

"তরুণী"র অভিনেতৃবৃন্দ সকলেই সুচারুরূপে তাঁদের কাজ সমাপন করেছেন। সব চেয়ে effective অভিনয় করেছেন কালাপাহাড়ের ভূমিকায় ললিত মিত্র। চলচ্চিত্রে এই অভিনেতাটি আজো বিশেষ নাম করতে পারেন নি কিন্তু কালাপাহাড়ের ভূমিকায় রূপসজ্জা ও অভিনয় এই দুই বিভাগেই তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে বুঝেছি সিনেমায় তাঁর নাম করতে বেশী দেরী লাগবে না। বিশেষ এক ধরণের টাইপ ভূমিকায় ললিতবাবু অপরিহার্য্য হয়ে উঠ্‌বেন শীঘ্রই। শুনলাম, ললিতবাবু যে-make-up-টি নিয়েছিলেন, সেটি করতে দেড়ঘণ্টা সময় লাগতো এবং মুখ থেকে সে make-up মুছে ফেলতেও সময় লাগতো সেই রকমই। ললিতবাবুর এত পরিশ্রমের make-up সার্থক হয়েছে।

ভূমেন রায়, জীবন গাঙ্গুলি, এবং রঞ্জিত রায়—এঁরা তিনজনেই বেশ সহজ সাবলীল অভিনয় করেছেন। জীবনবাবুর গানগুলি মন্দ হয় নি। রাধিকাবাবুর ভূমিকাটি ছিল খুবই ছোট। সেটুকু হয়েছে ভালোই। জয়নারায়ণ-এর কবি কবিজনোচিত হয়েছে।

*

মেয়েরা সকলেই সু-অভিনয় করেছেন। শ্রীমতী ডলি আর জ্যোৎস্না—এঁরা বোধ হয় এই প্রথম টকিতে অভিনয় করলেন; কিন্তু সেকথা তাঁদের অভিনয় দেখে মোটেই বোঝা যায় নি।

*

শ্রীমতী রাণীবালার "প্রতিমা" বাচনে এবং অভিব্যক্তিতে যেমন সরস তেমনি সুন্দর হয়েছে। পদ্ম, সত্য ও ভাল। আর সকলে যেমন হয় তেমনি।

"তরুণী"র সঙ্গে "মণিকাঞ্চন" নামে একটি তিন রীলের হাসির ছবি দেখানো হয়েছে। লেখক হচ্ছেন—তুলসীদাস লাহিড়ী। প্রধান ভূমিকাতেও তুলসীবাবু দেখা দিয়েছেন। অন্যান্য ভূমিকায় নেমেছেন—জয়নারায়ণবাবু, ধীরেন দাস, প্রভাবতী ইত্যাদি।

এক কপর্দ্দকহীন বাঙলা যুবক কেমন ক'রে চাকরী এবং স্ত্রীলাভ করলে তারই কাহিনী এই ছবিতে দেখানো হয়েছে। ছবিটির মধ্যে action-এর একান্ত অভাব থাকলেও অভিনয়, শব্দযন্ত্রের কাজ, এবং প্রযোজনার গুণে "মণিকাঞ্চন" দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিতে সক্ষম হয়েছে।

*

আশা করছি "তরুণী" এবং "মণি-কাঞ্চন" বহুদিন ধরে "রূপবাণীর" Box office-এর কাছে ভিড় জমিয়ে রাখবে।

অপরেশচন্দ্র

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ক্লাসিকে প্রতাপাদিত্য

ষ্টারে "প্রতাপাদিত্য" অভিনয়ের বিজ্ঞাপন বাহির হইবার পরেই স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, পরলোকগত সাহিত্যিক হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহার "বঙ্গের শেষ বীর" উপন্যাসখানি তাড়াতাড়ি নাটকাকারে পরিবর্ত্তন করেন এবং "সীতারামে"র ন্যায় অল্পদিনের মধ্যেই তাহার শিক্ষাদান এবং পোষাক পরিচ্ছদ ও দৃশ্যপটাদি সম্পূর্ণ করিয়া ক্লাসিক থিয়েটারে "প্রতাপাদিত্য" নাম দিয়া অভিনয় ঘোষণা করেন। ষ্টারে "প্রতাপাদিত্য" খুলিবার দুই সপ্তাহ পরেই ক্লাসিকে ইহার অভিনয় হয় (২৯শে আগষ্ট, ১৯০৩ খ্রীঃ)।

প্রতাপাদিত্য, শঙ্কর, রাজলক্ষ্মী ও ফুলমানির ভূমিকা যথাক্রমে অমরবাবু দানিবাবু, তিনকড়ি দাসী ও শ্রীমতী কুসুমকুমারী দক্ষতার সহিত অভিনয় করিলেও—ক্ষীরোদবাবুর "প্রতাপাদিত্যে"র নাট্য সৌন্দর্য্যের নিকট এ নাটক ক্ষীণপ্রভ হইয়া গিয়াছিল। অবশ্য এ কথাও বলিতে হইবে, হারাণবাবু যখন প্রতাপাদিত্য চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাস লিখিয়াছিলেন,

তখন তিনি জানিতেন না যে ভবিষ্যতে তাঁহার উপন্যাসখানি নাটকাকারে রঙ্গালয়ে অভিনীত হইবে। অনুরুদ্ধ হইয়া গিরিশচন্দ্র একখানি গান এই নাটকের নিমিত্ত বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। গানটী দর্শকগণের নিকট সমাদৃত হওয়ায় নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

"মাতর্বঙ্গ, কুরু ভয় ভঙ্গী
সন্তান তাপিত শাসিত মা!
পীড়িত ধর্ম্ম, পীড়িত মর্ম্ম
অবিরল প্রবল প্রবাহিত মা!
তূর্য্য নিনাদে, হর মা বিষাদে,
অবসাদে কেন মা পুত্র তব,
পূজ্য ভুবনে তব ধী-গৌরব;
শত্রু-বিমর্দ্দিনী, উঠগো জননি,
কৃপাণ-চমকে কঠোর গরজন,
রুধির-ধার ঝর ঝর বরিষণ,
কর নৃত্য রক্ত-পিপাসিত মা,—
রণরঙ্গে সন্তান ধাবিত মা!"

তারাবাঈ

এই সময়েই (১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৩ খ্রীঃ) ইউনিক থিয়েটারে (রয়েল বেঙ্গল রঙ্গমঞ্চে) 'শ্মশান' (মেবার পতন) নামক একখানি ঐতিহাসিক নাটক অভিনীত হয়। নাটকখানি সুবিধাজনক হয় নাই। ইহার কয়েক মাস পরে ইউনিক থিয়েটারেই (১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমদিকে) সুবিখ্যাত ডি, এল, রায়ের 'তারাবাঈ' নামক ঐতিহাসিক নাটক অভিনীত হয়। নাটকখানি বেশ জমিয়াছিল। কিরূপ সুযোগ্য অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংযোগে নাটকখানি সুঅভিনীত হইয়াছিল, নিম্নে তাহার পরিচয় দিলাম।—

রায়মল	তারকনাথ পালিত
সূর্য্যমল	চুনীলাল দেব
সঙ্গ	মনীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টুবাবু)
পৃথ্বীরাজ	সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)
জয়মল	শ্রীক্ষেত্রমোহন মিত্র
সুরতান	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে
প্রভুরাও	শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু)
সারঙ্গদেব	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ
তারাবাঈ	শ্রীমতী তারাসুন্দরী
তমসা	শ্রীমতী প্রকাশমণি
সুরতান-পত্নী	শ্রীমতী সুধীরাবালা (পটল)
পৃথ্বীরাজের-ভগ্নী	বিনোদিনী (হাঁদি)

সৎনাম

ইউনিক থিয়েটারে 'তারাবাঈ' অভিনীত হইবার কএক মাস পরে (৩০শে এপ্রেল, ১৯০৪ খ্রীঃ) ক্লাসিক থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটক 'সৎনাম' অভিনীত হয়। এই নাটকখানি প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, কিন্তু রিহার্স্যাল আরম্ভ করিয়াই বন্ধ থাকে। এই সুদীর্ঘকাল বন্ধ থাকিবার কারণ আমরা গ্রন্থকারের লিখিত 'সৎনাম' নাটকের ভূমিকা হইতেই উদ্ধৃত করিলাম।—

" * * * * প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে এই নাটকখানি রচিত হয়। এতদিন অভিনীত হয় নাই, তাহার কারণ,—'গুলসানা' নামে একটি চরিত্র এই নাটকে আছে। সেই চরিত্রটী 'প্রমদা' নাম্নী একটী অভিনেত্রীকে দেওয়া হয়। রিহার্স্যাল বলিতেছে, এমন সময়ে অভাগিনী দুরন্ত পীড়ায় আক্রান্তা হয়। তাহার যে সাংঘাতিক পীড়া, তখন ধারণা হয় নাই। পীড়ায় আরোগ্যলাভ করিয়া উক্ত অংশ অভিনয় করিবে, তাহারই অপেক্ষা করা হইতেছিল। (উক্ত অংশ—part—অভাগিনীকে লক্ষ্য করিয়াই লিখিত হইয়াছিল) তাহার পীড়া পাছে বৃদ্ধি হয়, এই আশঙ্কায় অন্যকে এ অংশ দেওয়া হয় নাই। বৎসরাধিক পীড়া ভোগ করিয়া অভাগিনীর মৃত্যু হইল। * পরে সম্প্রদায় বিদেশ যাওয়া প্রভৃতি নানা কারণে এ পর্য্যন্ত অভিনয় হয় নাই। এক্ষণে 'সৎনাম'—সাধারণের সম্মুখে পুরস্কার বা তিরস্কার অপেক্ষায় উপস্থিত।

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ। ১৮ই বৈশাখ, ১৩১১ সাল।"

* গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' নাটকে বালিকা 'লক্ষ্মী'র ভূমিকা লইয়া প্রমদাসুন্দরী সর্ব্বপ্রথম ষ্টার-রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণা হন। 'সরলা' নাটকে প্রমদার ভূমিকাভিনয়ে ইনি শক্তিশালীনী অভিনেত্রী বলিয়া প্রথম খ্যাতিলাভ করেন। ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত পাণ্ডব-গৌরব, ভ্রমর ও ভ্রান্তি নাটকে শ্রীকৃষ্ণ, রোহিণী ও অন্নদার ভূমিকার অভিনয়ে প্রমদাসুন্দরী যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। বহু নাটক, গীতিনাট্য ও প্রহসনে ইনি বহুসংখ্যক ভূমিকার অভিনয় করিয়াছিলেন। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে ইহার সম্বন্ধে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রবন্ধ-লেখক।

হুবহু অনুসরণ করলে ছবিখানি যে আরও হৃদয়গ্রাহী হত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কালাপাহাড়কে হত্যা ক'রে তার জীবনের অবসান ঘটানোর মধ্যে সুলভ এবং অসঙ্গত ঘটনা সংস্থাপনের পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

*

আর ভালো লাগেনি "তরুণী"র নেপথ্যসঙ্গীত। কনসার্টের ধরণে যে মিউজিক শুনলাম তা মোটেই আমাদের আনন্দ দ্যায় নি। নেপথ্যসঙ্গীত আরও অনেক উন্নত শ্রেণীর হওয়া উচিৎ ছিল।

ছবিখানি অন্যদিকে এত ভালো হয়েছে যে তার সঙ্গে নেপথ্যসঙ্গীত হয়েছে অত্যন্ত বেমানান।

*

খুবই ভালো হয়েছে "তরুণী"র ফোটোগ্রাফী! আলোকশিল্পী আগাগোড়া তাঁর কাজ সুন্দরভাবে বজায় করেছেন। কোথাও বিশেষ কোন ত্রুটি তো চোখে পড়েই নি উপরন্তু স্থানে স্থানে আলোকশিল্পের উৎকর্ষ দেখে ননীবাবুকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করছিল। ছবির openingটি চমৎকার!

*

"তরুণী"র অভিনেতৃবৃন্দ সকলেই সুচারুরূপে তাঁদের কাজ সমাপন করেছেন। সব চেয়ে effective অভিনয় করেছেন কালাপাহাড়ের ভূমিকায় ললিত মিত্র। চলচ্চিত্রে এই অভিনেতাটি আজো বিশেষ নাম করতে পারেন নি কিন্তু কালাপাহাড়ের ভূমিকায় রূপসজ্জা ও অভিনয় এই দুই বিভাগেই তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে বুঝেছি সিনেমায় তাঁর নাম করতে বেশী দেরী লাগবে না। বিশেষ এক ধরণের টাইপ ভূমিকায় ললিতবাবু অপরিহার্য্য হয়ে উঠবেন শীঘ্রই। শুনলাম, ললিতবাবু যে-make-up-টি নিয়েছিলেন, সেটি করতে দেড়ঘণ্টা সময় লাগতো এবং মুখ থেকে সে make-up মুছে ফেলতেও সময় লাগতো সেই রকমই। ললিতবাবুর এত পরিশ্রমের make-up সার্থক হয়েছে।

ভূমেন রায়, জীবন গাঙ্গুলি, এবং রঞ্জিত রায়—এঁরা তিনজনেই বেশ সহজ সাবলীল অভিনয় করেছেন। জীবনবাবুর গানগুলি মন্দ হয় নি। রাধিকাবাবুর ভূমিকাটি ছিল খুবই ছোট। সেটুকু হয়েছে ভালোই। জয়নারায়ণ-এর কবি কবিজনোচিত হয়েছে।

*

মেয়েরা সকলেই সু-অভিনয় করেছেন। শ্রীমতী ডলি আর জ্যোৎস্না—এঁরা বোধ হয় এই প্রথম টকিতে অভিনয় করলেন; কিন্তু সেকথা তাঁদের অভিনয় দেখে মোটেই বোঝা যায় নি।

*

শ্রীমতী রাণীবালার "প্রতিমা" বাচনে এবং অভিব্যক্তিতে যেমন সরস তেমনি সুন্দর হয়েছে। পদ্ম, সত্য ও ভাল। আর সকলে যেমন হয় তেমনি।

"তরুণী"র সঙ্গে "মণিকাঞ্চন" নামে একটি তিন রীলের হাসির ছবি দেখানো হয়েছে। লেখক হচ্ছেন—তুলসীদাস লাহিড়ী। প্রধান ভূমিকাতেও তুলসীবাবু দেখা দিয়েছেন। অন্যান্য ভূমিকায় নেমেছেন—জয়নারায়ণবাবু, ধীরেন দাস, প্রভাবতী ইত্যাদি।

এক কপর্দ্দকহীন বাঙলা যুবক কেমন ক'রে চাকরী এবং স্ত্রীলাভ করলে তারই কাহিনী এই ছবিতে দেখানো হয়েছে। ছবিটির মধ্যে action-এর একান্ত অভাব থাকলেও অভিনয়, শব্দযন্ত্রের কাজ, এবং প্রযোজনার গুণে "মণিকাঞ্চন" দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিতে সক্ষম হয়েছে।

*

আশা করছি "তরুণী" এবং "মণি-কাঞ্চন" বহুদিন ধরে "রূপবাণীর" Box office-এর কাছে ভিড় জমিয়ে রাখবে।

অপরেশচন্দ্র

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ক্লাসিকে প্রতাপাদিত্য

ষ্টারে "প্রতাপাদিত্য" অভিনয়ের বিজ্ঞাপন বাহির হইবার পরেই স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, পরলোকগত সাহিত্যিক হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহার "বঙ্গের শেষ বীর" উপন্যাসখানি তাড়াতাড়ি নাটকাকারে পরিবর্ত্তন করেন এবং "সীতারামে"র ন্যায় অল্পদিনের মধ্যেই তাহার শিক্ষাদান এবং পোষাক পরিচ্ছদ ও দৃশ্যপটাদি সম্পূর্ণ করিয়া ক্লাসিক থিয়েটারে "প্রতাপাদিত্য" নাম দিয়া অভিনয় ঘোষণা করেন। ষ্টারে "প্রতাপাদিত্য" খুলিবার দুই সপ্তাহ পরেই ক্লাসিকে ইহার অভিনয় হয় (২৯শে আগষ্ট, ১৯০৩ খ্রীঃ)।

প্রতাপাদিত্য, শঙ্কর, রাজলক্ষ্মী ও কুলজানির ভূমিকা যথাক্রমে অমরবাবু দানিবাবু, তিনকড়ি দাসী ও শ্রীমতী কুসুমকুমারী দক্ষতার সহিত অভিনয় করিলেও—ক্ষীরোদবাবুর "প্রতাপাদিত্যে"র নাট্য সৌন্দর্য্যের নিকট এ নাটক ক্ষীণপ্রভ হইয়া গিয়াছিল। অবশ্য এ কথাও ব'লতে হইবে, হারাণবাবু যখন প্রতাপাদিত্য চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাস লিখিয়াছিলেন,

তখন তিনি জানিতেন না যে ভবিষ্যতে তাঁহার উপন্যাসখানি নাটকাকারে রঙ্গালয়ে অভিনীত হইবে। অনুরুদ্ধ হইয়া গিরিশচন্দ্র একখানি গান এই নাটকের নিমিত্ত বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। গানটী দর্শকগণের নিকট সমাদৃত হওয়ায় নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

"মাতর্বঙ্গ, কুরু ভয় ভঙ্গী
সন্তান তাপিত শায়িত মা!
পীড়িত ধর্ম্ম, পীড়িত মর্ম্ম
অবিরল প্রবল প্রবাহিত মা!
তূর্য্য নিনাদে, হর মা বিষাদে,
অবসাদে কেন মা পুত্র তব,
পূজ্য ভুবনে তব ধী-গৌরব;
শত্রু-বিমর্দ্দিনী, উঠগো জননি,
কৃপাণ-চমকে কঠোর গরজন,
রুধির-ধারে ঝর ঝর বরিষণ,
কর নৃত্য রক্ত-পিপাসিত মা,—
রণরঙ্গে সন্তান ধায়িত মা!"

তারাবাঈ

এই সময়েই (১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৩ খ্রীঃ) ইউনিক থিয়েটারে (রয়েল বেঙ্গল রঙ্গমঞ্চে) 'শ্মশান' (মেবার পতন) নামক একখানি ঐতিহাসিক নাটক অভিনীত হয়। নাটকখানি সুবিধাজনক হয় নাই। ইহার কয়েক মাস পরে ইউনিক থিয়েটারেই (১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমদিকে) সুবিখ্যাত ডি, এল, রায়ের 'তারাবাঈ' নামক ঐতিহাসিক নাটক অভিনীত হয়। নাটকখানি বেশ জমিয়াছিল। কিরূপ সুযোগ্য অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংযোগে নাটকখানি সুঅভিনীত হইয়াছিল, নিম্নে তাহার পরিচয় দিলাম।—

রায়মল	তারকনাথ পালিত
সূর্য্যমল	চুনীলাল দেব
সঙ্গ	মনীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টুবাবু)
পৃথ্বীরাজ	সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)
জয়মল	শ্রীক্ষেত্রমোহন মিত্র
সুরতান	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে
প্রভুরাও	শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু)
সারঙ্গদেব	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ
তারাবাঈ	শ্রীমতী তারাসুন্দরী
তমসা	শ্রীমতী প্রকাশমণি
সুরতান-পত্নী	শ্রীমতী সুধীরাবালা (পটল)
পৃথ্বীরাজের-ভগ্নী	বিনোদিনী (হাঁদি)

সংনাম

ইউনিক থিয়েটারে 'তারাবাঈ' অভিনীত হইবার কএক মাস পরে (৩০শে এপ্রেল, ১৯০৪ খ্রীঃ) ক্লাসিক থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটক 'সংনাম' অভিনীত হয়। এই নাটকখানি প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, কিন্তু রিহার্স্যাল আরম্ভ করিয়াই বন্ধ থাকে। এই সুদীর্ঘকাল বন্ধ থাকিবার কারণ আমরা গ্রন্থকারের লিখিত 'সংনাম' নাটকের ভূমিকা হইতেই উদ্ধৃত করিলাম।—

"* * * প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে এই নাটকখানি রচিত হয়। এতদিন অভিনীত হয় নাই, তাহার কারণ,—'গুলসানা' নামে একটি চরিত্র এই নাটকে আছে। সেই চরিত্রটী 'প্রমদা' নাম্নী একটী অভিনেত্রীকে দেওয়া হয়। রিহার্স্যাল বলিতেছে, এমন সময়ে অভাগিনী দুরন্ত পীড়ায় আক্রান্তা হয়। তাহার যে সাংঘাতিক পীড়া, তখন ধারণা হয় নাই। পীড়ায় আরোগ্যলাভ করিয়া উক্ত অংশ অভিনয় করিবে, তাহারই অপেক্ষা করা হইতেছিল। (উক্ত অংশ—part—অভাগিনীকে লক্ষ্য করিয়াই লিখিত হইয়াছিল) তাহার পীড়া পাছে বৃদ্ধি হয়, এই আশঙ্কায় অন্যকে এ অংশ দেওয়া হয় নাই। বৎসরাধিক পীড়া ভোগ করিয়া অভাগিনীর মৃত্যু হইল। * পরে সম্প্রদায় বিদেশ যাওয়া প্রভৃতি নানা কারণে এ পর্য্যন্ত অভিনয় হয় নাই। এক্ষণে 'সংনাম'—সাধারণের সম্মুখে পুরস্কার বা তিরস্কার অপেক্ষায় উপস্থিত।

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ। ১৮ই বৈশাখ, ১৩১১ সাল।"

* গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' নাটকে বালিকা 'লক্ষ্মী'র ভূমিকা লইয়া প্রমদাসুন্দরী সর্ব্বপ্রথম ষ্টার-রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণা হন। 'সরলা' নাটকে প্রমদার ভূমিকাভিনয়ে ইনি শক্তিশালীনী অভিনেত্রী বলিয়া প্রথম খ্যাতিলাভ করেন। ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত পাণ্ডব-গৌরব, ভ্রমর ও ভ্রান্তি নাটকে শ্রীকৃষ্ণ, রোহিণী ও অন্নদার ভূমিকার অভিনয়ে প্রমদাসুন্দরী যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। বহু নাটক, গীতিনাট্য ও প্রহসনে ইনি বহুসংখ্যক ভূমিকার অভিনয় করিয়াছিলেন। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে ইহার সম্বন্ধে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রবন্ধ-লেখক।

কিন্তু অতি অশুভক্ষণে গিরিশচন্দ্র 'সৎনাম' নাটক রচনা করিয়াছিলেন। এই নাটকখানি হিন্দু-মুসলমান-দ্বন্দ্ব বিষয়ক, সুতরাং পরস্পর বিবদমান বিরোধী সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ নাটকে অপরিহার্য্য। গিরিশচন্দ্র 'সৎনাম' গ্রন্থের ভূমিকায় এ-কথা দৃষ্টান্তসহ উল্লেখ করিলেও মুসলমান সম্প্রদায় বিশেষরূপ চঞ্চল হইয়া উঠেন। সে সময়ের মুসলমান সংবাদপত্র সমূহেও অগ্নিতে ফুৎকারের ন্যায় এতদ্ সম্বন্ধে তীব্র আলোচনা হইতে থাকে। যাহা হউক, একদিকে মুসলমান সম্প্রদায়ের দারুণ চাঞ্চল্য, অন্যদিকে হিন্দুজাতির পরাজয়ে সাধারণ দর্শকগণও সেরূপ প্রসন্ন নহে,—এই উভয় কারণ মিলিত হইয়া 'সৎনাম' অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইল। থিয়েটারে কর্তৃপক্ষগণ চতুর্থ রজনীতে উত্তেজিত মুসলমানগণের জনতা দর্শনে তাঁহাদের প্রীতির নিমিত্ত 'সৎনামের' অভিনয় বন্ধ করিয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে 'ভ্রমর' ও 'দোললীলা'র অভিনয় ঘোষণা করেন।

ইহার কিছুকাল পরে ৺বিহারীলাল দত্তের ন্যাশান্যাল থিয়েটারে (রয়েল বেঙ্গল রঙ্গমঞ্চে) 'ভারত-গৌরব' নাম দিয়া সুপ্রসিদ্ধ নট-নাট্যকার চুনীলাল দেব কএক-রাত্রি 'সৎনাম' নাটক অভিনয় করেন। সৎনামের ইহাই শেষ অভিনয়।

সিরাজদ্দৌলা

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে মিনার্ভায় স্বর্গীয় মনোমোহন গোস্বামীর 'সংসার' ও বিহারী দত্তের ন্যাশান্যাল থিয়েটারে 'সমাজ' এবং মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' সামাজিক নাটক তিনখানি পর পর অভিনীত হয়। 'বলিদান' নাটকের পর গিরিশচন্দ্র পুনরায় 'রাণা প্রতাপ' নামে ঐতিহাসিক নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন। নাটকখানির দুই অঙ্ক লেখা প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময়ে তিনি সংবাদ পাইলেন, ষ্টার থিয়েটারে স্বর্গীয় ডি, এল, রায়ের 'রাণা প্রতাপ' রিহারস্যালে পড়িয়াছে। গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাটকখানি সম্পূর্ণ করিয়া রিহারস্যালে ফেলিতে বিলম্ব হইবে বুঝিয়া, উক্ত নাটকখানি সমাপ্ত করিতে বিরত হন, এবং 'সাহিত্য'-সম্পাদক পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতির প্ররোচনায় 'সিরাজদ্দৌলা' লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ডি, এল, রায়ের 'রাণা-প্রতাপ' ষ্টার থিয়েটারে ২২শে জুলাই (১৯০৫ খ্রীঃ) অভিনীত হয়, তার পরের সপ্তাহেই মিনার্ভা থিয়েটারে ঐ নাটকের অভিনয় হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত সংবাদ পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

মিনার্ভা থিয়েটারে ৯ই সেপ্টেম্বর (১৯০৫ খ্রীঃ) 'সিরাজদ্দৌলা' প্রথম অভিনীত হয়। এই নাটকের উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রশংসা-ধ্বনিতে সমস্ত দেশ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' বঙ্গনাট্যশালায় যে নূতন রস-প্রবাহের সূত্রপাত করিয়াছিল' 'সিরাজদ্দৌলা' অভিনয়ে সেই রসের বন্যা বহিয়া সমস্ত দেশ পরিপ্লাবিত করিয়া তুলিয়াছিল। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, 'সৎনাম' নাটকাভিনয় দর্শনে বহু মুসলমান বিরক্ত হইয়া ধৈর্য্যের সীমা হারাইয়াছিলেন, কিন্তু 'সিরাজদ্দৌলা' অভিনয় দর্শনে তাঁহারা আনন্দ প্রকাশের ভাষা হারাইয়াছিলেন। প্রথম রজনীর অভিনয় দর্শনে জনৈক মুসলমান কবি দর্শকগণের মধ্য হইতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া গিরিশচন্দ্রের উদ্দেশ্যে দুই ছত্র কবিতা আবৃত্তি করেন। তাঁহার মর্ম্ম এই—"হে গিরিশচন্দ্র তুমি সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো।"

ক্রমশঃ

আসিতেছে—

বালার্ক-কিরণসম দিগন্ত উদ্ভাসিত করিতে

কালী ফিল্‌ম্‌সের

নবীন অর্ঘ্য
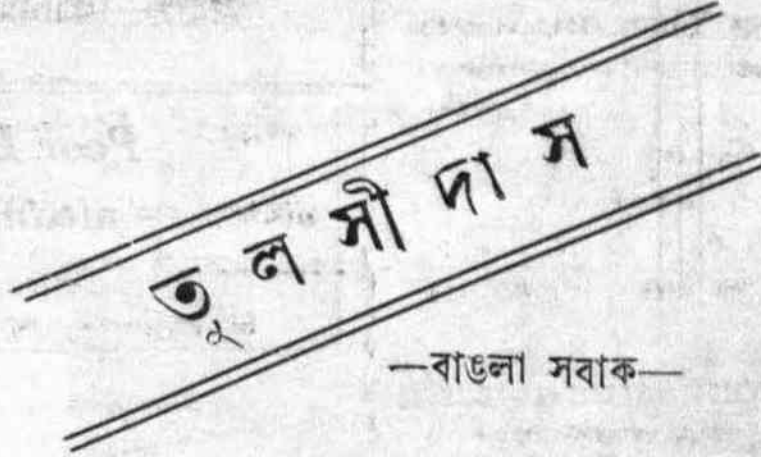
—বাঙলা সবাক—

আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

শনি ও রবিবার
তিনবার
বেলা ৩টা, সন্ধ্যা ৬-১৫
ও রাত্রি ৯॥ টায়

অন্যান্য দিন দুইবার
সন্ধ্যা ৬-১৫
ও রাত্রি ৯॥ টায়

৮৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, (শ্যামবাজার) কলিকাতা
টেলিফোন নং—১১৩৩ বড়বাজার

শনিবার ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে তৃতীয় সপ্তাহ আরম্ভ

মহুয়া　মহুয়া

!!! মহুয়া !!!

…সামনে অন্ধকার।　পিছনে ক্ষিপ্ত বেদের দল।

দুইদিকে দুস্তর দুঃখ জলধি।

তাহারই মাঝে প্রণয়ী-যুগলের আত্মাহুতি।

মর্ম্মস্পর্শী !　অদৃষ্টপূর্ব !!　মনোহর !!!

মহুয়া—মহুয়া—মহুয়া

সকাল ৯টা হইতে সকল শ্রেণীর টিকিট বিক্রয় হয়।

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা]   Regd. No. 1304.   [বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা

১০ম বর্ষ
৩৪শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
সহকারী সম্পাদক—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

৪ঠা আশ্বিন
১৩৪১

কলালাপ

গল্প শুনুন।

•

আমেরিকার সিট্‌ল্‌-সহরের (Seattle) মেট্রোপলিটান থিয়েটার। ভীড়ে ভীড়—প্রেক্ষাগারে তিল ধারণের জায়গা নেই। ক্যাথারাইন কর্ণেল তাঁর দলবল নিয়ে প্রথম সেই সহরে পাদপ্রদীপের সামনে দেখা দেবেন।

•

দর্শকরা অপেক্ষাই করছে—বিজ্ঞাপিত সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, তবু মিস্ কর্ণেলের দেখা নেই। তিনি তখনো পর্যন্ত মূলে সেই সহরেই এসে উপস্থিত হন নি—থিয়েটারে মঞ্চের উপর দেখা পাওয়া ত' অনেক দূরের কথা।

•

ওয়াশিংটন রাজ্য ঝড়বৃষ্টিতে ভেসে গেছে। মিস্ কর্ণেল এবং তাঁর সঙ্গীরা যে-ট্রেণে ক'রে সহরে আসছেন, তা' এই অপ্রত্যাশিত ঝড়-বৃষ্টির দরুণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে এসে পৌঁছোয় নি এবং কখন্ যে পৌঁছুবে, তারও কোনও ঠিক ঠিকানা নেই। উৎকণ্ঠা বেড়েই চলেছে, কিন্তু অধীরতা?—না, সে আছে দূরে—বহু দূরে; কারণ, দেখা যাচ্ছে, দর্শকরা ঝাড়া দু'ঘণ্টার ওপর ধ'রে বেশ সানন্দেই চুপটি ক'রে ব'সে আছে। তাদের বিশ্বাস, মিস্ কর্ণেলের ট্রেণ শেষ অব্দি নিশ্চয়ই এসে হাজির হবে এবং তাঁর অভিনয় দেখা তাদের বরাতে আছেই আছে।

•

রাত্রির দশটা চল্লিশ মিনিটের সময় থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ দর্শকদের জানালেন, মিস্ কর্ণেল অবশেষে সত্যিই এসে পৌঁছেচেন এবং দর্শকরা যদি কষ্ট ক'রে রাত একটা পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধ'রে ব'সে থাকতে রাজী থাকে, তা'হলে তিনি তাঁর অভিনয় সুরু করবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে পারেন—ঐ সময়ের আগে যবনিকা-উত্তোলন কোন ক্রমেই সম্ভবপর নয়।—আশ্চর্য্য, দর্শকরা বিনা আপত্তিতে খুব সোৎসাহেই ঘাড় নেড়ে তাদের সম্মতি জানালে।

•

এগারোটা দশ মিনিটে দৃশ্যপটাদি নিয়ে প্রথম গাড়ী থিয়েটারে এসে ঢুকল। অ্যাস্‌বেস্টস্‌-নির্ম্মিত প্রথম যবনিকা তুলে দেওয়া হ'ল সঙ্গে সঙ্গে। দর্শকরা সাগ্রহে পাতলা পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগল, এলিজাবেথ ব্যারেটের উইম্‌পোল ষ্ট্রীটস্থ বসবার ঘরখানিকে মঞ্চের উপর ধীরে ধীরে গ'ড়ে তোলা চলছে। কারণ, অভিনেয় নাটকটি হচ্ছে.- The Ba retts of Wimpole Street. অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ঝড়ের মত থিয়েটারে এল ট্যাক্সি চেপে; বড়দিনের সওগাত স্তূপাকার হয়ে রয়েছে তাদের জন্যে—সে দিকে তাদের ভ্রূক্ষেপও নেই; যে যার পোষাক গায়ে চড়িয়ে তড়িক্ ঘড়িক্ তৈরী হয়ে পড়ল মঞ্চাবতরণ করবার জন্যে। যবনিকা উঠল ঠিক তখন, যখন ঘড়িতে ঢং ক'রে বাজল একটা। মিস্ কর্ণেলের প্রথম পাদপ্রদীপের আলোক আসবার কথা ছিল বড়দিনের রাতে; কিন্তু ঘটনাচক্রে তা' অপ্লো তার পরদিন—রাত্রির একটা হচ্ছে নিশ্চয়ই পরদিন সকাল।

•

Chu-Chin-Chow-চিত্রে "আবদাল্লা"র ভূমিকায় জেট্‌ স্যাম

মিস্ কর্ণেলকে যখন এলিজাবেথ ব্যারেট-বেশে কোচের ওপর অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় দেখতে পাওয়া গেল, তখন প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত হয়ে উঠল অগণিত দর্শকের সমবেত কণ্ঠের সোল্লাস অভিনন্দন-বাণী দ্বারা। পর মুহূর্ত্তেই সমস্ত নিস্তব্ধ—এক সেকেণ্ডের ভিতরেই সরবতা যেন কোন্ অন্ধকারে দিল গা-ঢাকা; সকলেরই চোখ পেরেক-মারা হয়ে ব'সে রইল মঞ্চের উপর। অভিনয় হ'ল সুরু। রাত চারটের পর যখন শেষ-যবনিকা পড়ল, তখন আর একবার উঠল আনন্দ-ধ্বনি—ঘন ঘন করতালি আর শেষ হ'তে চায় না, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ওপর অজস্র প্রশংসা বর্ষণ ক'রেও দর্শকরা যেন নিজেদের অন্তরের আনন্দকে ভাষা দিতে পারছিল না।

•

মাত্র তিন ঘণ্টার অভিনয় দেখবার জন্যে যে-হাজারটি দর্শক রাত আটটা থেকে সুরু ক'রে পুরো পাঁচটা ঘণ্টা নিজেদের আসনের উপর ব'সে থাকতে পেরেছিল, তাদের ধৈর্য্যটাই বড়ো, না ক্যাথারাইন কর্ণেলের জনপ্রিয়তাটাই বড়ো, সেই কথা ভাব্ছি। এবং আরও ভাব্ছি, আমাদের এই বাঙলাদেশে এতখানি ধৈর্য্যের পরীক্ষা দর্শকরা কোনও দিন দিয়েছে কি না? শিশিরকুমার যখন জনপ্রিয়তার উচ্চতম শিখরে, তখনো দেখেছি, অত্যন্ত অনিবার্য্য কারণে তাঁর নাট্যমন্দিরের যবনিকা উঠতে সামান্য দেরী হ'লেই দর্শকরা হয়ে উঠত রীতিমত অসহিষ্ণু; অপেক্ষা তারাও ক'রত, কিন্তু সানন্দে নয়, নীরবে নয়, নেহাৎ অভিনয় দেখবার লোভ সামলাতে না পারার দায়ে প'ড়ে।—কিন্তু অনর্থক তুলনা করছি; কোথায় স্বাধীন আমেরিকা, আর কোথায় চির-পরাধীন বাঙলাদেশ—সাত সমুদ্দুর তের নদীর তফাৎ!—তাইত' যে-ব্যাপার মাত্র এই সেদিন, ১৯৩৩ সালের বড়দিনের রাতে ঘটেছিল সত্যিসত্যিই, তাকে আপনাদের কাছে বর্ণনা ক'রতে গিয়ে বললুম—'গল্প শুনুন।' এ-জিনিষকে সত্যি ব'লে কল্পনা করা কি মুখের কথা?

•

"নাচঘর-সম্পাদক" রঙ্মহলের "কাজ্রী"কে উপলক্ষ্য ক'রে একখানি 'খোলা চিঠি' দিয়েছেন। তা' স্থানান্তরে ছাপা হ'ল। এই চিঠি মারফত তিনি জানিয়েছেন, "কাজ্রী"র কোন রকম বিরুদ্ধ সমালোচনাই তিনি বরদাস্ত ক'রতে রাজী নন; কারণ "রঙ্মহলে"র ভিতর রয়েছেন তাঁর অগণিত বন্ধুজন এবং বিশেষ ক'রে, "কাজ্রী"র অন্যতম লেখক হচ্ছেন একাধারে তাঁর অকৃত্রিম সুহৃদ, প্রাণের দোসর, অগ্রজপ্রতিম, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এল্।—এবং এইজন্যেই তিনি "নাচঘরে" প্রকাশিত "কাজ্রী"-সমালোচনাকে খুসীর সহিত গ্রহণ ক'রতে ত' পারেন নি বটেই, বরং সমালোচকের স্পর্দ্ধা দেখে তাঁর হৃদয় রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

•

আমরা শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মশাইয়ের কাছে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। বন্ধুপ্রীতিকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে তিনি আপ্রাণ চেষ্টার ত্রুটী করেন না কখনই, এ-সত্য আমাদের ভালো ভাবেই জানা থাকা সত্বেও "কাজ্রী"-সমালোচনা ক'রে আমরা যে তাঁর বন্ধুত্বের বন্ধনকে শিথিল করবার উপলক্ষ্য হয়ে পড়েছি, এর জন্যে আমরা সত্যই মর্ম্মান্তিক দুঃখিত। আমাদের অশিষ্ট আচরণের ফলে তিনি যে এতখানি আঘাত পেয়েছেন, এ জেনে আমাদের লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে ক'রছে। তিনি আমাদের ক্ষমা করুন। হয়ত' আমাদেরই দেখবার ভুল। হয়ত' আমাদের অজ্ঞাতেই আমাদের চোখের উপর কেউ রঙীন পরকলা বসিয়ে দিয়েছিল, যার ফলে আমরা "কাজ্রী"র "যবনিকার অন্তরালে" দেখেছি, ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ছড়াছড়ি এবং ভদ্রমেয়েদের কুৎসিৎ বমনোদ্রেককারী চিত্র। কিংবা যাদের আমরা এই দৃশ্যগুলিকে দেখেছি, তারা হচ্ছে একান্ত ভাবেই সৌরীন্দ্রমোহনের কল্পলোকের সামগ্রী—মানসকন্যা, মানসপুত্র এবং মানসবন্ধু-বান্ধবীনিচয়; বাস্তব জগতের কঠিন মাটির উপর দিয়ে তাদের চলাফেরা ক'রতে দেখা আমাদের নিতান্তই চোখের দোষ!

•

কিন্তু চোখের সামনে অ্যাল্ম্যানাক্ ঝোলানো থাকা সত্বেও আজ মাসের ক' তারিখ, তা পাশের লোককে জিজ্ঞাসা করি কেন? ছাপার হরফে সৌরীন্দ্রমোহনের "যবনিকার অন্তরালে" অবশেষে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা মন দিয়ে তা' প'ড়ে দেখব এবং আমাদের সম্পাদক-মশাইকেও তা' প'ড়ে দেখতে অনুরোধ করব। ভালো ক'রে প'ড়ে দেখবার পর নিশ্চয়ই আমাদের বুঝতে কষ্ট হবে না লেখক তাঁর লেখার ভিতর দিয়ে কি ব'লতে চেয়েছেন এবং কি ব'লতে চান নি। এবং আমরা আর একটা জিনিষ দেখতে পাব, "রঙ্মহলে"র অভিনয়ে "কাজ্রী"তে মঞ্চের উপর থেকে যা বলা হয়, মুদ্রিত 'যবনিকার অন্তরালে"তে তা হুবহু বজায় আছে কি না?—আমাদের এখন থেকেই কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে, তা' থাকবে না। কারণ, আমরা যে-দু'রাত "কাজ্রী" দেখেছি, তাতেই পাত্রপাত্রীদের মুখে দু'চারটী কথাবার্ত্তায় বেশ দ্রষ্টব্য পরিবর্ত্তন দেখতে পেয়েছি; গোড়ার দিনে যা ছিল একেবারে সোজাসুজি এবং স্পষ্ট, দ্বিতীয় দিনেই তা' হয়ে উঠেছে অমনি একটু ঘোরালো এবং অল্প একটু অস্পষ্ট। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন ওঠে, এই পরিবর্ত্তনের জন্যে দায়ী কে?—লেখক, অভিনেতা, না কর্তৃপক্ষ? অবশ্য আমাদের উপস্থিতির দু'রাত্তিরই যখন লেখককে সশরীরে প্রেক্ষাগারে হাজির থাকতে দেখেছি, তখন দায়ী যেই হোন্ না কেন, লেখকের অনুমতি বা approval যে ছিল, সে-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।...কিন্তু পরের কথা হবে পরে অর্থাৎ বারান্তরে। নাঃ, তাতো হবে না, সম্পাদক-মশাই যে "কাজ্রী" সম্পর্কে সত্যি কথা কইতে মানা ক'রে দিয়েছেন।

•

কিন্তু "কাজ্রী"র সমালোচনার নামে যে-প্রহসন অভিনীত হচ্ছে আজ কাগজে কাগজে, তা' নিয়ে দু'এক কথা কইলে নিশ্চয়ই দোষের হবে না। এবং তাই বল্ছি, এই সম্পর্কে সম্প্রতি শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল যে-অমূল্য ফতোয়াটি জারী করেছেন, তা প'ড়ে আমরা যথেষ্টই কৌতুক অনুভব করেছি। "কাজ্রী"র "যবনিকার অন্তরালে"র দৃশ্যে যদি 'শালীনতার আব্রু হানি' না হয়ে থাকে, তা হ'লে সুধীরেন্দ্রবাবুর শালীনতাজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের মনে সন্দেহ উদ্রেক হবার যথেষ্টই কারণ ঘট্ছে। অভিনয়-অন্তে কোন ভদ্রমেয়ে যদি অপর পুরুষের সঙ্গে বারাকপুরের বাগানে রাত কাটিয়ে ভোরের আগেই বাড়ী ঢুকে 'শালীনতার আব্রু' বজায় রাখতে পারেন, তা' হ'লে সে-আব্রু খ'সে পড়াই ভালো এবং তাকে সুধীরেন্দ্রবাবু পছন্দ ক'রলেও আমরা কোনদিনই ক'রতে পারব না। 'নাট্যবিলাসী সৌখীন সম্প্রদায়ের প্রগতির দৌড় (?)'-এর প্রতি সুধীরেন্দ্রবাবুর যে বড্ড বেশী বিরাগ দেখ্ছি। কিন্তু Calcutta Amateur Players নামে যে-সৌখীন-সম্প্রদায় ভদ্র ছেলে এবং মেয়ে নিয়ে মাঝে মাঝে অভিনয়-আয়োজন ক'রে থাকেন, তার দু'এক-খানি অনুষ্ঠানপত্রে তাঁর নাম এবং চেহারা যে পরিষ্কার ক'রে ছাপা হয়েছিল, এ-কথা কি তিনি এত শিগ্গিরই ভুলে গেছেন? সুধীরেন্দ্রবাবুর স্মরণ-শক্তির এতখানি খর্ব্বতা আদৌ প্রশংসনীয় নয়। সুধীরেন্দ্রবাবু দুঃখপ্রকাশ

করেছেন, "সব কয়টি টাইপ আঁক্‌তে পারলেই সোনায় সোহাগা হোত।"—তা হয়ত হ'ত, কিন্তু সব ক'টির মধ্যে কে সোনা, আর কে সোহাগা, তা' চিনিয়ে দেবার লোক বাকী থাক্‌ত কি? বেড়াজালে পুকুর শুদ্ধ, মাছই যে উঠে আস্‌ত, at other's cost আনন্দ উপভোগ ক'রত কে, সেটুকু কি সুধীরবাবু ভেবে দেখবার সময় পান নি?

*

গেল বুধবার বৈকালে একটি নূতন ধরণের বৈঠক হয়ে গেছে নাট্য-নিকেতনে। নিকেতনের তরফ থেকে শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র গুহ আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন চা-জলপানের পর সুখ্যাত নট শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য লিখিত একখানি নূতন নাটকের কয়েকটি দৃশ্য শোনবার জন্তে। এগারটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ নাটকের চারটি মাত্র দৃশ্য শুনে তার সম্বন্ধে কোনরকম মতামতই দেওয়া যায় না; তবে আমরা বলতে পারি, আমরা খুব মনঃসংযোগ ক'রেই মনোরঞ্জনবাবুর পাঠ শুনেছি এবং যত-শীঘ্র-সম্ভব সমস্ত নাটকখানাই শোনবার আগ্রহ জন্মেছে আমাদের মনে। মঞ্চ এবং চিত্র—উভয় জগতেই অভিনেতা হিসেবে মনোরঞ্জনবাবুর সুনাম আছে যথেষ্টই। অতঃপর ভবিষ্যতে যদি দেখি, নাট্যকার রূপেও তিনি প্রতিষ্ঠালাভ ক'রতে সক্ষম হয়েছেন, তা'হ'লে আমরা আরো ঢের-বেশী আনন্দলাভই করব।

*

গেল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের বাসভবনে মার্কিণ-মহিলা শ্রীমতী রাগিণী দেবী হিন্দু নৃত্যকলা সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দিয়েছেন। তার সঙ্গে তিনি নিজে এবং দক্ষিণ ভারতীয় নর্ত্তক শ্রীগোপীনাথ নৃত্যকলাও দেখিয়েছেন। এ বিষয়ে আসচে বারে বিস্তৃত আলোচনা করবার ইচ্ছে রইল।

*

"বাঙলার মেয়ে"-র প্রথম অভিনয়রাত্রে অর্থাৎ গেল বৃহস্পতিবার ৩রা আশ্বিন রঙ্‌মহল প্রাচীরপত্র মারফত জানিয়েছেন—"আগামী ১২ইডিসেম্বর বুধবার সন্ধ্যা ৭টায় শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত স্রাবণা" অভিনীত হবে। বেশ ভালকথা। কিন্তু এই বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এমন অনেক বড়ো বড়ো কথা কয়েছেন, যার যৎসামান্ত আলোচনা দরকার। আমরা এ-প্রসঙ্গে বারান্তরে আস্‌ব—এবার স্থানাভাব।

*

গেল ১৪ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার আল্‌ফ্রেড রঙ্গমঞ্চে বঙ্গীয় যক্ষ্মানিবারক সমিতির (Tuberculosis Association of Bengal) সাহায্যকল্পে কল্পতরু-মিলনবীথি তাঁদেরই বিশিষ্ট সদস্য শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "মরণের ডাক" এবং "চল্‌তি পথে" অভিনয় করেছিলেন। আমরা যথাসময়ে উপস্থিত হ'তে পারিনি ব'লে প্রথম বইটির অভিনয় দেখতে পাইনি। "চল্‌তি পথে" আমরা দেখেছি এবং দেখে বল্‌ছি, নাটক এবং অভিনয়—দুইই আমাদের আশাতীত আনন্দ দিয়েছে; বিশেষ ক'রে স্বয়ং নাট্যকার তারকবাবু যে অসামান্ত নাটনিপুণতা দেখিয়েছেন, তা উচ্চ প্রশংসালাভের যোগ্য।

খোলা চিঠি

(হেমেন্দ্রকুমার রায়)

"রঙ্‌মহলে"র "কাজ্‌রী" নিয়ে পেয়ালায় চায়ের ধাক্কা তরঙ্গায়িত হ'য়ে উঠেছে। এবং এর জন্তে অনেক সুপরিচিত সাংবাদিক ও সাহিত্য-সেবক মানহানির মামলার দায়েও পড়েছেন।

"কাজ্‌রী" আমি দেখিনি। "রঙ্‌মহলে"র পরিচালকরা দয়া ক'রে আমায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন বটে, কিন্তু সময়াভাবে ইচ্ছাসত্বেও যাওয়া হ'য়ে ওঠে নি।

জনকয়েক হুজুগে লোক আমার কাছে এসে প্রায়ই ব'লে যাচ্ছেন যে, "কাজ্‌রী'তে আপনাকে আক্রমণ করা হ'য়েছে।" 'বাতায়ন'-সম্পাদক মশাই তো' স্পষ্ট ভাষায় আমার নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেছেন। শুধু আমি নই, "কাজরী"তে নাকি আরো অনেককেও ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হয়েছে। এমন কি, বিশিষ্ট ভদ্রমহিলারাও নাকি কলমের খোঁচা থেকে অব্যাহতি লাভ করেন নি। অভিযোগ সত্য হ'লে যথেষ্ট ভয়েরই কথা—আমার পক্ষে তো বটেই এবং অন্তান্তদের পক্ষেও।

সকলেই জানেন, রঙ্গালয়ের ব্যঙ্গনাট্যে একটি চরিত্র গঠন ক'রে ব্যক্তিগত ভাবে যখন কারুকে গালাগাল দেওয়া হয়, তখন প্রকারান্তরে উক্ত ব্যক্তিবিশেষের শ্রেষ্ঠতাই স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়। শ্রেষ্ঠের উপরে নিকৃষ্টের রাগ চিরকালই থাকে এবং চিরকাল থাকবেও।

কিন্তু "রঙ্‌মহলে"র কর্তৃপক্ষ আমাকে এমন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি রূপে স্বীকার করবেন ব'লে মনে হয় না। এবং আমি যে তাঁদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এ-কথা আমি নিজেও ভাবতে পারি না।

জ্ঞানতঃ এবং ধর্ম্মতঃ সামাজিক এমন কোন অপরাধই জীবনে আমি করি নি, যে-জন্তে ভদ্রসমাজে আমাকে মাথা হেঁট করতে হবে। ভণ্ডামির মুখোসও আমি কোনদিন মুখে পরি নি। লুকোচুরি আমার স্বভাবের বিরোধী। সুতরাং আমার ভিতরে গালাগালি দেবার কোন গোপন বস্তু আছে, এটাও আমি [illegible] মনে করি না, তেমনি "রঙ্‌মহলে"র কর্ণধারগণ যে আমাকেই গালাগাল দেবেন, এ-কথাও আমি বিশ্বাস করি না। কারণ "রঙ্‌মহলে"র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ ব্যক্তিই আমার বিশিষ্ট বন্ধু এবং "রঙ্‌মহলে"র টিকিট-ঘরে যখন রূপোর টাকার গান শোনা যেত না, সেই দুঃসময়ে তাদের অনুরোধে "রঙ্‌মহলে"র জন্তে দিনের পর দিন ধ'রে অক্লান্তভাবে বিনা পারিশ্রমিকে আমি দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রম করেছি। সে-কৃতজ্ঞতা তাঁরা যে এত শীঘ্রই ভুলে যাবেন, এ-একটা অসম্ভব, অবিশ্বাস্য কথা। তারপর তাঁদের অনেকের সঙ্গেই ব্যক্তিগত ভাবে আমার পরিচয় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাঁদের অনেকেই বন্ধুত্বস্নেহে আমাকে 'হেমেন-দা' ব'লে সম্মানিত না ক'রে থাক্‌তে পারেন না। ধরুন, শ্রীমান যোগেশ চৌধুরী ও শ্রীমান সতু সেনের কথা। এঁদের আমি এত ভালোবাসি যে, যখনই এঁরা আমার বাড়ীতে এসে আমাকে ধন্য করেছেন, তখনই এঁরা যা বড় ভালোবাসেন সেই খাদ্যের ও "পানীয়ে"র দ্বারা এঁদের প্রাণপণে পরিতুষ্ট না ক'রে থাকতে পারিনি। শ্রীমান সতু সেন প্রভৃতির সঙ্গে এমন কত রাত যে পরমানন্দে কাটিয়েছি তা আর গুন্‌তিতে পাওয়া যায় না। এমন কি দু'চার দিন ওরা দয়া ক'রে আমার বাড়ীতে না এলে আমি ছুটে গিয়ে তাঁদের ধ'রে রথে চড়িয়ে নিয়ে আস্‌তেও কসুর করি নি। মনে ক'রে দেখুন, এত প্রেম, এত বন্ধুত্ব! ... ... তারপর আমার অতি-পুরাতন বন্ধু শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র

মিত্রের কথা। বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ে আমিই ঘটকালি ক'রে তাঁকে সর্ব্বপ্রথমে নিয়ে আসি। তিনিও "কাজ্‌রী"র অন্যতম "প্রযোজক।" এঁরা সকলেই গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি। এঁরা যেখানে আছেন সেখানে যে আমার গালাগালি শোনা যায়, এ কথা যে বলে সে অতি-বড় মিথ্যুক। না, এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করব না,—আমাদের বন্ধুত্বের বন্ধন আল্‌গা করবার জন্যে এ হ'চ্ছে দুষ্ট লোকের অশিষ্ট ফন্দি মাত্র।

তারপর আমার প্রাণের আত্মীয়, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের কথা। তিনি বয়সে আমার চেয়ে বড়, বিদ্যায় ও রচনা-শক্তিতেও আমার চেয়ে ঢের-বেশী উঁচুতে; কাজেই তাঁকে আমি অগ্রজের মতই শ্রদ্ধা করি। তার উপরে তিনি আমাদের "ভারতী"-গোষ্ঠীভুক্ত একান্ত আপনার লোক। "কাজরী" আমি দেখিনি। কিন্তু শুনছি তার মধ্যে 'যবনিকার অন্তরালে' নামে নাকি তাঁরই লেখা কয়েকটি দৃশ্য আছে। এবং সেই সব দৃশ্যেই নাকি বাঙ্‌লার মাতৃজাতির, আমার এবং আরো অনেকের কুৎসিত চিত্র আছে। "ভারতী"-গোষ্ঠীভুক্ত সাহিত্য-সেবকগণের যে অত্যন্ত আভিজাত্য, আধুনিকতা, সংস্কৃতি ও বন্ধুপ্রীতি ছিল, এ-কথা সকলেই স্বীকার ক'রে থাকেন। এ-সম্প্রদায়ের কেউ যে আধুনিক মহিলাদের এবং কোন বন্ধুকে ব্যক্তিগতভাবে নোংরা নিন্দা করতে পারেন, এ-কথাও সত্য হওয়া সম্ভবপর নয়। বিশেষ সৌরীন্দ্রমোহন আমার এমন বন্ধু যে, যখন এই "কাজরী"র জোর-মহলা চলছে তখনও তিনি দুই পুত্র, তিন কন্যা ও সহধর্ম্মিণীকে নিয়ে আমার কুটিরে পায়ের ধুলো দিয়ে রাত বারোটা পর্য্যন্ত কত প্রাণের আলাপ ক'রে এবং আমার যৎসামান্য আহারাদির আয়োজনকে সার্থক ক'রে গেছেন। আপনারা ভেবে দেখুন, শ্যাম যদি রামকে গালাগাল দেয়, তাহ'লে রামের বাড়ীতে সপরিবারে গিয়ে শ্যাম কি কখনো অকুণ্ঠিত ভাবে আত্মীয়তা জানাতে ও ভূরিভোজন করতে পারে? নভেলেই এমন অস্বাভাবিক দৃশ্য সুলভ, বাস্তব জীবনে এটা অসম্ভব। আমাদের সৌরীন্দ্রমোহন ছোটো উপন্যাসের ভণ্ড ও চক্ষুলজ্জাহীন দুরাত্মা নন, তিনি হচ্ছেন পরম উদার, ভদ্র ও ভ্যাস্তো মানুষ। এবং এই সব কারণেই আমাদের সৌরীন্দ্রমোহন যে "কাজ্‌রী"র অংশবিশেষে আমাকে (এবং অন্যান্য অনেক স্ত্রী-পুরুষকে) ব্যক্তিগত গালাগাল দিয়েছেন ও কুৎসিত চিত্র এঁকেছেন, একথা আমি স্বচক্ষে দেখ্‌লেও বা স্বকর্ণে শুন্‌লেও বিশ্বাস করতে রাজি হব না। দুষ্ট লোকেরা নিশ্চয়ই মিথ্যা হুজুগ তুলেছেন।

আজ কয়েক সপ্তাহ ধ'রে "নাচঘরে"র কোন কাজই আমি দেখতে পারিনি। এবং "নাচঘরে"র সম্পাদকীয় বিভাগে আমার লেখা যে আর প্রকাশিত হয় না, "কলালাপে"র মধ্যে প্রকাশ্যে যথাসময়েই আমি তা জানিয়ে দিয়েছি। সংপ্রতি "নাচঘরে" "কাজরী" সম্বন্ধে একাধিক সমালোচনা আমার চোখে পড়ল। দেখছি, "নাচঘরে"র সমালোচক "কাজরী"র বিরুদ্ধ সমালোচনা ক'রেছেন। স্থানে-স্থানে তাঁর ভাষাও বেশ আদর-মাখানো ও মধুময় নয়। যে-"রঙ্‌মহলে"র পরিচালকগণ আমার পরম বন্ধুজন এবং যে-"কাজরী"র অন্যতম লেখক হ'চ্ছেন আমার অকৃত্রিম সুহৃদ ও আমার অগ্রজপ্রতিম শুভানুধ্যায়ী শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল, সেই-"রঙ্‌মহলে"রই "কাজরী" নিয়ে কোনরকম প্রতিকূল সমালোচনাই আমি সহ্য করব না। "নাচঘরে"র সমালোচকের স্পর্দ্ধা দেখে আমার হৃদয় স্তম্ভিত হ'য়ে গেছে। আমার ব্যস্ততার সুযোগ নিয়েই তিনি এই প্রকাণ্ড কুকাণ্ডটি করেছেন। কিন্তু উপায় নেই, যা হবার তা হ'য়ে গেছে। ভবিষ্যতে আমার কাগজে "কাজরী" সম্বন্ধে যদি কিছু বেরোয়,—তাহ'লে "রঙ্‌মহলে"র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আমার পরম বন্ধুগণ জেনে রাখুন, সে হবে তাঁদেরই নির্জ্জলা প্রশংসা ও তোষামোদ মাত্র। ... ... অতএব মাভৈঃ!

চিত্রপুরীঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

(রঞ্জন রুদ্র)

চিত্র পরিচয়ঃ (১) Double Harness (রেডিও পিকচার্স)

প্রধান ভূমিকায়—য়্যান হার্ডিং; উইলিয়াম পাওয়েল।

কাল থেকে এলফিনষ্টোনে সুরু হবে।

*

যাঁরা ছবির মধ্যে রসের আস্বাদ পেতে চান, রোমান্স, প্রেম এবং নরনারীর বাস্তবজীবনের ঘাতপ্রতিঘাত দেখে যাঁরা আনন্দ পেতে চান, তাঁরা উক্ত ছবিখানি দেখলে বিশেষ খুসী হবেন।

Double Harness আধুনিক জীবনের ছবি বটে, কিন্তু এর মধ্যে চিরদিনের সত্য ফুটে উঠেছে। য়্যান হার্ডিং একটি বিবাহ-বিদ্বেষী মেয়ের ভূমিকায় নেমেছেন। বিবাহের পর দম্পতির জীবনে যে ভীষণ গণ্ডগোলের সূত্রপাত হ'ল, তার চমৎকার সরস আলেখ্য এই ছবিকে রূপদান করেছে।

(২) The Scarlet Empress (প্যারামাউন্ট)

প্রধান ভূমিকায়—মার্লিন ডিয়েট্রিক্

পরিচালক—জোসেফ্ ভন্ ষ্টার্নবার্গ

২৭ সেপ্টেম্বর থেকে এম্পায়ারে দেখানো হবে।

*

ক্ষুদ্র রাজ্য প্রাশিয়ার সরলহৃদয়া মেয়ে সোফিয়া কেমন ক'রে একদিন রাশিয়ার প্রবলপরাক্রান্তা সাম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারাইন নামে জগতে

প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল, The Scarlet Empress হচ্ছে তারই কাহিনী-চিত্র। ক্যাথারাইনের ডায়েরীর উপর ভিত্তি ক'রেই ছবিখানি গ'ড়ে উঠেছে।

•

জগতের শ্রেষ্ঠতম পরিচালক ষ্টার্ণবার্গ এমন কৌশলে ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে খুব দ্রুত চালে (quick tempo-তে) ছবিটিকে পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন যে, মনের নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ থাকেনা একেবারেই। এমন অপূর্ব্ব mixing ও double exposure-এর নিদর্শন আমরা খুব কম ছবিতেই দেখেছি। সারা ছবিটিতে গোটা পাঁচ-সাত caption আছে। তার প্রত্যেকটিই হচ্ছে সাহিত্যের হীরকচূর্ণ। ছবির আলোক-নিয়ন্ত্রণ ও আবহ-সঙ্গীত চোখ এবং কানকে সারাক্ষণ মাতিয়ে রেখেছিল। Scarlet Empress-এর আর এক বিশেষত্ব হচ্ছে এর দৃশ্য-মহিমা। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যযুগের রাশিয়ার প্রচণ্ড সমৃদ্ধিকে জীবন্ত করবার জন্য সর্ব্বদিক দিয়ে ছবিখানির ভিতর এমন দৃশ্যসমাবেশ করা হয়েছে যে, তাই দেখেই চক্ষু রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে যায় অভিনয়ের প্রতি লক্ষ্য করবার অবসর থাকে না।

•

কিন্তু তবু লক্ষ্য ক'রতে হয়! ক্যাথারাইনের ভূমিকায় মার্লিনের অভিনয় বাইরের ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে একটি মেয়ের চরিত্র পরিবর্ত্তনকে যে-অপরূপ রূপে ফুটিয়ে তুলেছে, তা যে সহজে ভোলবার উপায় নেই। গ্র্যাণ্ড ডিউক ও জেরিণার ভূমিকায় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নাট্যনিপুণতাও অল্প প্রশংসার সামগ্রী নয়।

Scarlet Empress চিত্রামোদীদের খুসী করবে বহু পরিমাণে।

•

(৩) "Chu-Chin-Chow"

ভূমিকালিপি হ'চ্ছে এইরূপ :

আলিবাবা—জর্জ্জ রোবে ; আবুহাসান - ফ্রিট্‌জ কোর্টনার ; জারাত্—অ্যানা মে ওয়াং ; মরজানা—গার্ল অ গাইল্ ; আবহুল্লা—জেট্‌স্থাম্।

এই হপ্তা থেকে "নিউ এম্পায়ারে" এই উৎকৃষ্ট বিলিতি ছবিখানি দেখানো হ'চ্ছে। "আলিবাবা"র গল্পের সঙ্গে পরিচিত নন, আমাদের দেশে এমন লোকের ত' নাম জানিনা। সেই পরিচিত গল্পকেই কিছু অদল-বদল ক'রে এমন সুন্দররূপে ছবিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে যে, দেখে খুসী হওয়া ছাড়া ভিন্ন উপায় নেই। ডাকাতদের গুহার দৃশ্য, বিশেষ ক'রে গুহার দরজা খোলা এবং বন্ধ হওয়ার কৌশলটি চমৎকারভাবে দেখানো হ'য়েছে। উল্লেখযোগ্য অভিনয় ক'রেছেন আলিবাবা, আবহুল্লা, দস্যুসর্দ্দার, দলের গুপ্তচর, মরজানা এবং অনেকেই। ছবিখানির প্রকাশ-ভঙ্গীর কৌশলে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। পরিচালনায় কৃতিত্বের পরিচয় পেয়েছি। অন্যান্য বিভাগের কাজও ভালো লেগেছে।

•

প্যারামাউন্ট কোম্পানী যে কয়েকখানি প্রথম শ্রেণীর ছবি আমাদের দেশের দর্শকদের কাছে উপহার দেবার মনস্থ করেছেন, তার মধ্যে একখানি ছবি New Empire-এ দেখানো হ'য়ে গেল ; তার নাম Death Takes a Holiday. প্রধান ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন ফ্রেড্‌রিক মার্চ্চ। ছবির বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে এবং অভিনেতৃদের অভিনয়নৈপুণ্যের উৎকর্ষে Death Takes a Holidayর মতো উপভোগ্য ছবি দেখিনি ব'ল্লেও অত্যুক্তি হয় না।

•

রাধা ফিল্মের "শচীদুলাল" এই শনিবার থেকে ছয়ের হপ্তায় পা বাড়াল। শ্রীমতী পূর্ণিমার অভিনয় ছবিখানিকে আরও বহুদিন বাঁচিয়ে রাখবে ব'লে মনে হয়। ঢাকার "মোতিমহল টকী"তে "শচীদুলালে"র তৃতীয় সপ্তাহ চল্‌ছে।

•

রাধার দু'জন দক্ষ ক্যামেরাম্যান—শ্রীযুক্ত চিন্তা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বীরেন দে সম্প্রতি জয়পুরের মহারাজার রাজকীয় উৎসবাদির চিত্রগ্রহণ-কার্য্য সমাধা ক'রে কলকাতায় ফিরেছেন।

•

পরিচালক শ্রীচারু রায় তাঁর হিন্দী "রাজনটী"র শুটিং শেষ করেছেন। ছবিখানির এখন সম্পাদনা চল্‌ছে। "দক্ষযজ্ঞে"র সম্পাদনকার্য্য এই সপ্তাহের ভিতরেই সমাপ্ত হবে ব'লে আশা করা যাচ্ছে।

•

নিউ সিনেমার অধ্যক্ষ মিঃ পি, ঘোষাল (ছবিবাবু) বিশ্বকর্ম্মা পূজার রাত্রে বহু লোককে নিমন্ত্রণ করেছিলেন হাল্কা জলযোগে (light refreshment-এ)। কিন্তু গিয়ে দেখি, ব্যবস্থা যা হয়েছে, তা হচ্ছে রীতিমত ভারী ভূরিভোজন। আমরা অবশ্য তার সদ্ব্যবহার ক'রতে ক্রটী করি নি এবং আশা করছি, ছবিবাবু মাঝে মাঝে কারণে অকারণে এ-রকম গুরুতর 'হাল্কা জলযোগে' আহ্বান ক'রে আমাদের অশেষ ধন্যবাদ ভাজন হ'তে কিছুমাত্র কার্পণ্য করবেন না।

•

চার বছর আগে শুনেছিলুম, অরোরা ফিল্ম কোম্পানী 'নিয়তি' নামে একখানা ছবি তুলছে, যার গল্পলেখক হচ্ছেন গীতা-নাট্যকার শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী। এবং শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম, যোগেশবাবুই নাকি তার পরিচালনা করছেন। ছবিখানি, কি জানি কেন, তখন বাজারে বেরুতে পায় নি। এতকাল ধামা চাপা থাকবার পর, দেখছি, এই টকীর

ঢকানিনাদের যুগে, 'নিয়তি' নির্ব্বাক ছবি 'জুপিটার'কে আশ্রয় ক'রে ভাগ্যপরীক্ষা করবার চেষ্টায় বেরিয়েছে। কর্ত্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, ছবিতে প্রাণ আছে। কিন্তু প্রাণটি কি অবস্থায় আছে,—ধড়াধ্বড় ক'রে লাফাচ্ছে, না কোনক্রমে ধুকপুক করছে—তা' আমরা এখনও দেখে আসতে পারি নি। কিন্তু দেখে আসব নিশ্চয়ই এবং তার ফলাফল জানাব বারান্তরে।

অপরেশচন্দ্র

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ভারতবিখ্যাত লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক মিনার্ভায় আসিয়া "সিরাজদ্দৌলা'র অভিনয় দর্শনে পরম সন্তোষ প্রকাশ করেন। গিরিশচন্দ্র এই নাটকে "করিমচাচা"র ভূমিকা অভিনয় করিতেন। তিনি সেই বেশেই রঙ্গমঞ্চে নতজানু হইয়া ইংরাজী ভাষায় তিলককে অভিনন্দিত করেন। অভিনন্দনে তিনি অতি বিনীতভাবে একটী অপ্রিয় সত্য কথা তাঁহাকে বলিয়াছেন। তাহার ভাবার্থ এই,—"হে মহোদয়, আপনার জাতি হইতেই এ দেশে ইংরাজ-রাজত্বের সূত্রপাত। আপনার জাতির অত্যাচারেই অর্থাৎ বর্গীর হাঙ্গামায় উৎপীড়িত হইয়া নবাব আলিবর্দ্দি দেশবাসীকে আত্মরক্ষার নিমিত্ত অস্ত্রাদি রক্ষার আজ্ঞা দেন। সেই অজুহাতে ইংরাজেরা কলিকাতার চতুষ্পার্শে মারহাট্টা খাদ নামে এক পরিখা খনন এবং দুর্গ-প্রাকার নির্ম্মাণ করেন। বর্গীর হাঙ্গামা চুকিয়া যাইবার পর নবাব সিরাজদ্দৌলা উক্ত দুর্গ-প্রাকার ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য বারবার আদেশ দিলেও যখন ইংরাজ নীরব হইয়া রহিলেন, তখন ক্রোধে নবাব কলিকাতা আক্রমণ করিলেন। পরিণামে—ইংরাজ জয়লাভ করিয়া এ দেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন ”

ইতিপূর্ব্বে নানা কারণে মিনার্ভা থিয়েটার হাইকোর্ট হইতে প্রকাশ্য নিলামে উঠে। গিরিশচন্দ্রের উৎসাহে মিনার্ভার কর্ত্তৃপক্ষগণ ৫৯৪০০৲ টাকায় উক্ত থিয়েটার খরিদ করিয়াছিলেন। এক 'সিরাজদ্দৌলা'র অভিনয়েই উক্ত টাকা উঠিয়া আসে।

'সিরাজদ্দৌলা'র পর বঙ্গনাট্যশালায় দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটক অভিনয়ের উৎসাহ প্রবলবেগে বাড়িয়া যায়। মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্রের 'মীর-কাসেম', 'ছত্রপতি শিবাজী'; ষ্টারে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত', 'পদ্মিনী', 'নন্দকুমার' প্রভৃতি অভিনীত হয়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই জানুয়ারী তারিখে গভর্ণমেণ্ট 'সিরাজদ্দৌলা' প্রভৃতি উক্ত নাটকগুলির অভিনয় এবং প্রচার বন্ধ করিয়া দেন।

অপরেশচন্দ্রের মিনার্ভা ত্যাগ

'সিরাজদ্দৌলা'র রিহার্স্যাল আরম্ভে অপরেশবাবু নানা কারণে মিনার্ভা পরিত্যাগ করায় গিরিশচন্দ্রের নাম ম্যানেজার বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয়। ব্যক্তিগত বোধে সকল কারণ উল্লেখ না করিয়া তন্মধ্যে একটি কারণ প্রকাশিত করিলাম।—

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অপরেশবাবুর উন্নতির দিকে প্রথম হইতেই মনোমোহনবাবুর বিশেষ আগ্রহ এবং লক্ষ্য ছিল। 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের প্রধান নায়ক 'সিরাজদ্দৌলা'র ভূমিকা অপরেশবাবুকে দিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। কিন্তু ষড়যন্ত্র-জাল-জড়িত, অস্থিরচিত্ত সিরাজের মুহুর্মুহু ভাব-পরিবর্ত্তনের কঠিন ভূমিকা একজন নবীন অভিনেতাকে দিতে গিরিশচন্দ্র অসম্মত হন। তিনি সিরাজের ভূমিকা দানিবাবুকে দিয়া পরবর্ত্তী উল্লেখযোগ্য মোহনলালের ভূমিকা অপরেশবাবুকে দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। মিনার্ভা থিয়েটারের অন্যতম অংশীদার ধীর ও স্থির-বুদ্ধি স্বর্গীয় মহেন্দ্রকুমার মিত্র এম-এ, বি-এল্ গিরিশবাবুর মত সমর্থন করেন। অপরেশচন্দ্র সে সময়ে—মিনার্ভা থিয়েটারের ম্যানেজার। তাঁহার একটী দল ছিল,—তাহার উপর মনোমোহনবাবু তাঁহার পৃষ্ঠ-পোষক। উভয় দলের রেষারেষিতে থিয়েটারের ভাবী অশুভ আশঙ্কায় বুদ্ধিমান অপরেশচন্দ্র আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া থিয়েটার পরিত্যাগ করেন। তিনি এ সম্বন্ধে তাঁহার 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"এই 'সিরাজদ্দৌলা'র সময়েই নানা কারণে কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আমার মনোমালিন্যের সূচনা হয়। দলাদলি যেমন বাঙ্গলার সকল ক্ষেত্রে সকল কার্য্যে বাঙলার বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখিয়াছে, বাঙলার থিয়েটারে তাহার ব্যতিক্রম ইহার সৃষ্টি-দিন হইতেই হয় নাই এবং ভগবানের ইচ্ছায় আজও সে-বৈশিষ্ট্য অপ্রতিহতভাবেই তাহার প্রভাব অটুট রাখিয়াছে। আমাদের সময়েও এই দলাদলি—এই ভেদনীতি আত্মপ্রকাশ করিতে ত্রুটী করে নাই। থিয়েটারে দুইটা দল হইল। 'সিরাজদ্দৌলা'র প্রথম 'সিরাজে'র ভূমিকা দেওয়া হয় আমাকে—অবশ্যই ইহা মনোমোহনবাবুর ইচ্ছায়; গিরিশবাবুর অভিপ্রায় ছিল, এ ভূমিকা দানিবাবুকে দিবার। দল বাঁধিলেই প্রতি পক্ষই নিজের বল বৃদ্ধির চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য, কেহ কাহারও হাতে যাইবেন না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝিয়া আমি একদিন মনোমোহনবাবুকে না বলিয়াই গিরিশবাবুর হাতে সিরাজের পার্ট-টি ফিরাইয়া দিয়া আসিলাম এবং 'সিরাজদ্দৌলা' খুলিবার কিছুদিন পূর্ব্বে ভাদ্রমাসেই মিনার্ভার সহিত সংস্রব ত্যাগ করিলাম।"

(ক্রমশঃ)

PHILISONOR

It's the winner—

"ফিলিসোনর" যন্ত্র শব্দ বিষয়ে উৎকৃষ্ট চিত্রের শব্দ বিক্ষেপ নিখুঁতভাবেই সম্পাদন করে, এমন কি শব্দ গ্রহণে ত্রুটীযুক্ত চিত্রের শব্দনিক্ষেপও ভালোভাবেই করিয়া থাকে।

"ফিলিসোনার" শব্দযন্ত্রের ব্যবহার যে বিক্রয়লব্ধ অর্থকে ক্রমবৃদ্ধির পক্ষে চালিত করে, তাহার জন্য পৃথক কোন প্রমাণের আবশ্যকতা নাই।

"ফিলিসোনার"-যন্ত্রের অধিকারীরা জানেন,—আজকালকার বাজারের সব চেয়ে সেরা শব্দযন্ত্রটির তাঁহারা মালিক। তাঁহাদের চক্ষু, কর্ণ এবং তাঁহাদের চিত্রগৃহের শ্রোতারা তাঁহাদের এই কথা বলিয়া দেয়।

"ফিলিসোনার" যন্ত্রের অধিকারী হইয়া যাঁহারা আনন্দ অনুভব করিতেছেন, আপনিও কেন তাঁহাদের দলভুক্ত হউন না ?

এক্ষণে আপনার প্রথম কর্ত্তব্য হইতেছে, অবিলম্বে ফিলিপ্‌সের নিজস্ব স্বল্পায়তন প্রদর্শনীগৃহে বিনাব্যয়ে ১৯৩৫—মডেলের ফিলিপ্‌স্ যন্ত্রের ব্যবহার নিজ চক্ষে দর্শন করা। ইহার জন্য আপনাকে কোনরূপ বাধ্যতার ভিতর আসিতে হইবে না।

নিম্নের কুপনটী ভর্ত্তি করিয়া ফিলিপ্‌স্ কোম্পানীর নিকট প্রেরণ করুন।

CUT OUT THIS COUPON

TO
PHILIPS ELECTRICAL CO., (INDIA) LTD.
HEYSAM ROAD, CALCUTTA

I wish to have a free demonstration of the Philisonor Talkie Equipment on September............1934 at one of your showrooms in Calcutta or Delhi.

Name ....

Address ....

Occupation ....

Position ....

P. P. K. 10

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা]　Regd. No. 1304.　[বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা

১০ম বর্ষ
৩৫শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
সহকারী সম্পাদক—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

১১ই আশ্বিন
১৩৪১

কলালাপ

বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, তা'হ'লে আজকাল কল্‌কাতার থিয়েটারগুলিতে কি ধরণের নাটক চল্‌বে?

*

প্রশ্ন কঠিন। তবু জবাব দিতে হ'ল, বন্ধু নাছোড়বন্দা। বললুম, চল্‌বে একমাত্র রাম-সীতা কাহিনী, তা' সে যে-কোন রূপেই (form-এই) হোক্ না কেন।—কথাটা একটু খুলে বলা দরকার।

*

রামায়ণের যে-জিনিষটা সাধারণ বাঙালীর চিত্তকে স্পর্শ করে, তা হচ্ছে এই।—বেচারী সীতা অমন ভালো মেয়ে হয়েও কপালগুণে কি দুঃখই না পেয়েছিল!—সীতার মন্দ ভাগ্যের কথা ভেবে বাঙালীর চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।—আজ রঙ্গালয়ের অভিনয়কে সাফল্যমণ্ডিত করতে হ'লে দর্শকদের ভিতর কান্নার দরিয়া ছোটাতে হবে এবং এই কাজটি অতি-সহজে হাসিল করবার জন্যে নাটকের মধ্যে এমন একটি বা দু'টি স্ত্রী-চরিত্রের আমদানী করতে হবে, যারা দর্শকদের মতে সীতারই সমগোত্রীয়া অর্থাৎ যারা বিবাহিতা হ'লে হবে সতী-সাধ্বী পতিপরায়ণা এবং অবিবাহিতা হ'লে হবে মিষ্ট-চরিত্র, আদর্শ প্রেমিকা এবং অনন্ত গুণের অধিকারী হয়েও যারা জীবনে পাবে অশেষ দুঃখ। মনে রাখতে হবে, এই দুঃখ মাত্র ভাত-কাপড়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাকলে চলবে না; শ্বশুর-শাশুড়ী বা বিধবা ননদের কাছ থেকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনাই এই দুঃখের চরম সীমা নির্দ্দেশ করবে না; এবং অবিবাহিতার পক্ষে দারিদ্র্য, পাড়াপড়সীর বাক্য-যন্ত্রণা প্রভৃতিই যথেষ্ট দুঃখ ব'লে বিবেচিত হবে না।—বিবাহিতা এবং অবিবাহিতা—এই দুই ধরণের 'লক্ষী' মেয়েরই দুঃখ তখনই অশেষের পর্য্যায়ে উঠবে যখন দেখা যাবে যে, তারা স্বামী এবং প্রেমিকের কাছ থেকে পাচ্ছে আঘাত—তাদের প্রেমাস্পদের সঙ্গ হ'তে হচ্ছে তাদের বিচ্ছেদ, স্বামী বা প্রেমিকের সঙ্গে দেহমনে মিলিত হ'তে না পেরে তারা ভেঙে পড়চে খান্ খান্ হয়ে, বিরহানলে পুড়ে তারা হচ্ছে ছারখার, তাদের জীবন হচ্ছে ব্যর্থ ইত্যাদি ইত্যাদি। নারীর কাছে প্রেমবঞ্চিতা হওয়ার চেয়ে বড়ো দুঃখ নেই এবং যে-কোন একটি বা দশটি কারণকে সহায় ক'রে এই দুঃখটাকে যত বেশী বড়ো ক'রে নাটকের মধ্যে দেখাতে পারা যাবে, নাটকের অভিনয় ঠিক সেই পরিমাণেই হবে সাফল্যমণ্ডিত—অর্থ এবং যশ উভয় দিক থেকেই।

*

কী ভালো মেয়ে কী ভাবেই না প্রেম-বঞ্চিতা হ'ল, স্বামী বা

শিব-পার্ব্বতী-নৃত্যে
শ্রীমতী রাগিনী দেবী ও শ্রীগোপীনাথ

প্রেমিকের জন্যে বেচারার কষ্টের অবধি নেই—অর্থাৎ এক কথায় মেয়েটি হচ্ছে জ্যান্তো সীতা!—ব্যস, এইটুকু হচ্ছে দরকার আজকালকার নাটকে এবং এর বেশী আর দরকার নেই। নাটক পৌরাণিক, ঐতিহাসিক বা সামাজিক—যাই হোক না কেন, ক্ষতি নেই, যদি এই জিনিষটি তার ভিতরে ভালো ক'রে ফেনিয়ে তুলতে পারা যায়। তবে আমদের অনুমান হয়, পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক থেকে সামাজিক নাটককেই আজকের দিনের দর্শকরা বেশী পছন্দ করবেন; কেননা পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক আবেষ্টনের ভিতরকার 'সীতা'-চরিত্র থেকে সামাজিক-'সীতা'কে তাঁদের ঢের-বেশী আপনার ব'লে মনে হবে এবং সেই কারণেই তা' সক্ষম হবে তাঁদের চিত্তে অধিকতর দরদের সৃষ্টি ক'রতে।

*

আসল কথাই হচ্ছে এই দরদ। দর্শকের মনে দরদ জাগিয়ে তুলতে না পারলে নাট্যাভিনয় হবে ব্যর্থ। We care more for emotion than for intellect. সাইকোলজির মারপ্যাচ দেখতে, বুদ্ধিরাজ্যের (intellectual world-এর) ভূরিভোজ খেতে আমাদের দর্শকরা রঙ্গালয়ে যান না। ইব্‌সেন, হাউপ্টম্যান, আন্দ্রীভ, বেনাভান্তে, টুর্গেনিভ, ষ্ট্রীণ্ডবার্গ, নোয়েল কাওয়ার্ড, ও'নীল প্রভৃতি-পড়া আধুনিকতাগ্রস্ত মুষ্টিমেয় ব্যক্তিসমষ্টির জন্যে আমাদের রঙ্গালয় নয়; আমাদের রঙ্গালয় আজও পর্য্যন্ত মাত্র তাঁদেরই উপর নির্ভর করে, যাঁদের মন হচ্ছে খাঁটী বাঙালী,—যে-বাঙালী হচ্ছে ভাবপ্রবণ, যার ধর্ম্ম হচ্ছে 'নামে রুচি, জীবে দয়া', যার দেবতা হচ্ছে 'প্রেমের ঠাকুর'—শক্তির নয়, যার জীবন হচ্ছে জন্ম থেকে সুরু ক'রে মৃত্যুর পর পর্য্যন্ত খালি কান্না, আর কান্না, আর কান্না,—আনন্দ এবং দুঃখ—দুইয়েতেই যে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েই আনন্দ পায়।—অতএব নাটককে জমিয়ে তুলতে হ'লে দর্শকদের ভিতর কান্নার তুফান তোলবার ব্যবস্থা করতেই হবে এবং এর জন্যে অতি-সহজ পন্থা হচ্ছে—আমরা আগে যা বলেছি, তাই অর্থাৎ নাটকের ভিতর চমৎকার ক'রে 'সীতা'-চরিত্র চিত্রিত করা।—আমাদের কথা শুনে বন্ধু খুসীই হয়েছিলেন; আপনারা হবেন কিনা বলতে পারি না। তবে আমরা যা বলেছি, তা হচ্ছে নির্জ্জলা সত্যি কথা এবং অতিরঞ্জন কিছু নেই এর ভিতর—এই হচ্ছে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

*

মধুর—একটি চমৎকার মধুর এবং স্মরণীয় সন্ধ্যা আমরা কাটিয়ে এসেছি গেল বৃহস্পতিবার ২০শে সেপ্টেম্বর শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের বাস-ভবনে। তাঁর ওখানে সেদিন ছিল প্রাচীন হিন্দু-নৃত্য সম্বন্ধে মার্কিন-মহিলা শ্রীমতী রাগিণী দেবীর বক্তৃতা। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—প্রাচীন হিন্দু-নৃত্য একালে প্রায় লুপ্ত হয়ে গেলেও এখনও তা অবিকৃত ভাবে বেঁচে রয়েছে ভারতের কোন কোন জায়গায়; উদাহরণ স্বরূপ তিনি নাম করেছেন, মালাবার এবং তাঞ্জোরের। বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে তিনি কয়েকটি প্রাচীন মুদ্রার ব্যাখ্যাও করেছিলেন। নব রসকে রূপ দিয়েছিলেন তাঁর নৃত্য-সহচর শ্রীগোপীনাথ এবং স্বীকার ক'রতে বাধা নেই, এই রূপদানকে আমরা খুব সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি ব'লে গ্রহণ ক'রতে পারি নি। হরিণ, পাখী, অর্জ্জুনের ধনু-আকর্ষণ, হস্তী-সর্প-সিংহ-কাহিনী—এই ক'টিকেও মূক-অভিনয় ও মুদ্রার সাহায্যে চিত্রিত করেছিলেন শ্রীগোপীনাথ। চিত্র হিসেবে নূতনত্বপূর্ণ এবং উপভোগ্য হ'লেও তাল বা rhythm-এর অভাবের জন্যে এইগুলিকে আমরা নৃত্যের পর্য্যায়ভুক্ত ব'লে মনে ক'রতে পারছি না।

*

কিন্তু উদাহরণ সংবলিত বক্তৃতার পরে শ্রীমতী রাগিণী দেবী যখন তাঞ্জোরের দেবনৃত্য দেখালেন, তখন আমরা বিস্মিত হয়েছিলুম এই ভেবে যে, এই মার্কিন-মহিলাটি মাত্র বছর ছয়েকের মধ্যে ভারতীয় নৃত্যবিদ্যায় এতখানি উন্নতি করলেন কি ক'রে? যদিও তাঁর গতি এখনও পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠেনি, তবু তিনি যে আমাদের দেশের নৃত্যকে আয়ত্বে আনতে পেরেছেন, একথা আমাদের স্বীকার ক'রতে হবে একশো বার। এবং এর পরে যখন শ্রীগোপীনাথ তাঁর সঙ্গে "শিব-শঙ্কর-ক্রীড়া"-নৃত্যকে লীলায়িত ক'রে তুললেন আমাদের চোখের সামনে, তখন বুঝতে বাকী রইল না, কার সাহায্য পেয়ে বিদেশিনী-মহিলা আজ আমাদের এতখানি চমক লাগিয়ে দিয়েছেন। "শিব"-বেশে শ্রীগোপীনাথের ভ্রূভঙ্গ, দেহভঙ্গী, হাতের মুদ্রা এবং পায়ের কাজ আমাদের যে-আনন্দ দিয়েছে, তা হচ্ছে অনির্ব্বচনীয়। বিশেষ ক'রে তাঁর "শৃঙ্গার-তাণ্ডব"-কে আমরা মনে রাখব বহুদিন। দক্ষিণ-ভারতের এই নবীন নর্ত্তকটিকে আমরা একটি অভিনব আবিষ্কার ব'লে সম্মানিত ক'রতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করছি না। এই সঙ্গে আর একজনের নাম না ক'রলে অন্যায় হবে; তিনি হচ্ছেন পণ্ডিত শ্রীরমেশচন্দ্র ঠাকুর। তাঁর "তবলা-তরঙ্গ"-কে আমরা উপভোগ করেছি প্রচুর পরিমাণে। সুরুচিসঙ্গত দৃশ্যসজ্জা সমন্বয়ে এমন একটি সুমধুর আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবার জন্যে আমরা শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়কে অগণিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

*

রঙ্‌মহলের নুতন নাটক "বাংলার মেয়ে" ইতিমধ্যে দুই রাত্রি অভিনীত হয়ে গেল। শুনেছি, প্রথম দিনে এর অভিনয় হয়েছিল প্রায় আট ঘণ্টা ধ'রে এবং দ্বিতীয় দিনে ওই সময়টা ক'মে দাঁড়িয়েছে সওয়া ছ'ঘণ্টা। এবং আরও শুনছি, বইটাকে আরও খানিকটা কাটছাট ক'রে অভিনয়ের সময়টাকে টেনে কমিয়ে পৌনে ছ'ঘণ্টায় দাঁড় করানো হবে।—এই উপলক্ষ্যে আমরা একটি কথা বলব। আমাদের বেশ মনে আছে, গেল ২২শে শ্রাবণ মঙ্গলবার রঙ্‌মহল "বাংলার মেয়ে"র প্রথম অভিনয়-রজনীর তারিখ ঘোষণা করেছিলেন।—ওরা আশ্বিন থেকে প্রায় দেড় মাস আগে অভিনয়-তারিখ ঘোষণা করবার বাহাদুরী দেখাবার পরে নতুন নাটকের অভিনয়-সময় সম্বন্ধে অবহিত না হওয়া কর্তৃপক্ষের পক্ষে বেশ প্রশংসার কথা নয়।

*

"রাবণে"র বিজ্ঞপ্তি প্রসঙ্গে রঙ্‌মহল লিখেছেন, "আধুনিক নাট্যজগতে রঙ্‌মহল সপ্রমাণ করিয়াছেন:—সামাজিক, ঐতিহাসিক, গীতি ও কৌতুক-নাট্য প্রযোজনার তাহারা অপরাজেয়।"—ময়রা নিজের দইকে টক বলে না। প্রত্যেক কেশতৈলের মালিকই ব'লে থাকেন, তাঁর তেলই বাজারের সেরা এবং এমনি ধারা শ্রেষ্ঠত্বের বিজ্ঞাপন ছোট-বড়ো সব ব্যবসাদারই দিয়ে থাকেন। আর্টের হাটেও রঙ্‌মহল অবশ্য ব্যবসা করতেই বসেছেন এবং সেদিক দিয়ে উপরের লাইনটির বিরুদ্ধে একটাও কথা বলা চলে না। নইলে কথাটির যাথার্থ্য সম্বন্ধে যে যথেষ্টই সন্দেহের কারণ আছে, তা আপনি-আমি-তিনিও যেমন জানেন, "রঙ্‌মহলে"র কর্তৃপক্ষও নিশ্চয়ই তার থেকে কিছু কম জানেন না। তবুও যে এর সম্বন্ধে উল্লেখ করতে হ'ল, তার একমাত্র বৈধ কারণ হচ্ছে, আর্টের ক্ষেত্রে এমন বিজ্ঞাপন এই প্রথম দৃষ্টিগোচর হল।

*

গেল বৃহস্পতিবার নব-নাট্যমন্দিরের "সরমা" অবগুণ্ঠন মোচন করেছেন। "সরমা"র রূপলাবণ্য কেমন, সে-খবর আসচে হপ্তায় দেব।

•

আমাদের যাঁরা নিমন্ত্রণ ক'রে থাকেন বা করা আবশ্যক ব'লে বিবেচনা করেন, এমন সব প্রতিষ্ঠানকে আমরা একটি কথা জানিয়ে রাখতে চাই। 'নাচঘরে'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাউকে তাঁরা যদি ব্যক্তিগতভাবে নিমন্ত্রণ করেন, তাহ'লে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি মাত্র ব্যক্তি হিসেবেই নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে থাকেন এবং সে-নিমন্ত্রণের সঙ্গে 'নাচঘরে'র কোন যোগই থাকে না। কাজেই এই ধরনের নিমন্ত্রণের ফলে "নাচঘরে" যে কোন রকম আলোচনা বা সংবাদ প্রকাশিত হবে, এমন জিনিষ আশা করা তাঁদের পক্ষে নিশ্চয়ই সঙ্গত নয়। অবশ্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ইচ্ছা করলে ব্যক্তিগত-ভাবে তাঁর মতামত নাচঘর কিংবা অন্য যে-কোন কাগজেই প্রকাশিত করতে পারেন; কিন্তু সে-মতামত "নাচঘরে"র মতামত হিসেবে গণ্য হবে না কোন দিনই।

গান

(হেমেন্দ্রকুমার রায়)

বনমানুষ নইকো আমি
বনের মানুষ ভাই,
বনে বনে মনে মনে
মনের মানুষ চাই—
আমি, বনের মানুষ ভাই!

*

সে যে আমার বনবালা—
গলায় সেঁউতি-ফুলের মালা,
কোয়েল-দোয়েল-শ্যামার সাথে
তারই যে নাম গাই—
আমি, বনের মানুষ ভাই!

*

জানি আমি বন-বাদাড়ে কোথায় ফোটে ঘাসের ফুল,
কোন্ সে ঘাটে শ্যামলা মেয়ে জল্‌কে যেতে এলায় চুল।

*

জানি আমি তার হাসিতে
কি গান জাগে প্রাণ-বাঁশীতে,
আমার কথা বলব তারে
একলা যদি পাই।
আমি, বনের মানুষ ভাই!

চিত্রপুরী: প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

(রঞ্জন রুদ্র)

চিত্র পরিচয়: Wharf Angel (প্যারামাউণ্ট)
প্রধান ভূমিকায়—ডোরোথি জেল্।
কাল থেকে এলফিন্‌ষ্টোনে দেখানো হবে।

•

Wharf Angel একটি চিরন্তন প্রেমের কাহিনী—দুটী পুরুষ এবং একটি নারীর মধ্যে প্রেমের যে ঘাত-প্রতিঘাত ফুটে উঠেছিল, তারই আলেখ্য এই ছবিতে দেখানো হয়েছে।

Wharf Angel এর নতুনত্ব হচ্ছে এর দৃশ্যসংস্থাপন এবং গল্পের treatment; শেষোক্ত গুণে ছবিটি যারপরনাই উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোর বারবেরি কোষ্ট নামক স্থানে পুলিসের প্রতিপত্তি ছিলনা বল্লেই হয়—সেখানে ছিল বে-আইনীর রাজত্ব। এই বারবেরি কোষ্টে ছিল একটি স্ত্রীলোকের হোটেল—Mother Bright's Place. সেখানে নানা দেশের আইন-লঙ্ঘনকারী ব্যক্তিদের গতিবিধি ছিল। তাদের মধ্যে টার্ক এবং কোমোর নাম উল্লেখযোগ্য। সেখানে একটি মেয়ে ছিল, তার নাম টয় টার্ক প্রবলভাবে তার প্রেমে পড়ল।

•

যেদিন ছুটি ফুরুলে টার্ক এবং তার বন্ধুরা প্রস্থান করবে, সেদিন এক মহা গণ্ডগোল বাধলো। কোমোকে পুলিস তাড়া করল—সে নাকি নরহত্যার অপরাধে অপরাধী। কোমোকে দেখে টার্কের খুব পছন্দ হ'ল; সে তাড়াতাড়ি Mother Brightকে ব'লে তার হোটেলে তাকে লুকিয়ে ফেল্লে। পুলিস তাকে ধরতে পারল না।

এদিকে হোটেলে ঢুকে দৈবক্রমে কোমো টয়-এর ঘরে প্রবেশ করল। হঠাৎ একজন অপরিচিতকে দেখে টয় ভয় পেল; তারপর কৌতূহলান্বিতা হ'ল; তারপর তাকে ভালবাসল।

•

সকাল বেলা কোমো টয়কে চিঠি লিখে গেল যে, সে তার সঙ্গে আবার দেখা করবে। তারপর টার্কের সঙ্গে সে চীনযাত্রা শুরু করল। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে দুই বন্ধুতে তাদের প্রেমের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে লাগলো; দুজনেই প্রেমে পড়েছে কিন্তু তারা জানেনা যে, একই মেয়েকে দু'জনে ভালবেসেছে। ইতিমধ্যে পুলিস কোমোকে ধরবার জন্যে মোটা টাকা পুরস্কার ঘোষণা ক'রে তাকে অন্বেষণ করছিল। টার্ক বল্লে—কোমোকে যে ধরিয়ে দেবে, তাকে সে নিশ্চয় হত্যা করবে।

*

টয় কোমোর কাছে এলো। সে তাকে নিয়ে পালাতে চায়। টার্ক

একথা শুনে এত রেগে উঠ্‌লো যে, সে নিজের অজ্ঞাতসারে পুলিসের কাছে কোমোর কথা ব'লে দিলে এবং কোমো গ্রেপ্তার হ'ল। তখন টম টার্ককে বিদ্রূপ ক'রে তার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে—"বন্ধুকে যে ধরিয়ে দেবে, তাকে আমি হত্যা করব।"

টার্ক পুরস্কারের টাকা টমকে দিয়ে দিলে। তারপর তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলে—কোমোকে ধরিয়ে দেবার পর থেকে সে অতিমাত্রায় অনুতপ্ত হ'য়ে পড়েছিল।

টম তখন সেই টাকা নিয়ে ভাল উকিল নিযুক্ত ক'রে মামলায় কোমোর নির্দোষিতা প্রমাণ করবার ব্যবস্থা করতে লাগলো।

•

Wharf Angel-এর নায়িকা ডোরোথি জেল্ উনিশ বছরের মেয়ে। এই তাঁর প্রথম ছবি। দুবার তিনি আন্তর্জাতিক সৌন্দর্য্য-প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করেছেন। চিত্র-বিশেষজ্ঞরা এই তরুণী নটীর সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চাশা পোষণ করেন।

•

(২) Merry Monarch (Algra Sepic Film, France)

প্রধান ভূমিকায়—এমিল্ জেনিংস্।

পরিচালক—অ্যালেক্‌সিস্ গ্রেনোস্কি।

আপনারা কি Merry Monarch দেখেছেন? যদি দেখে থাকেন, তা' হ'লে আপনাদের ভাগ্যবান্ ব'লে মানতে রাজী আছি। যদি না দেখে থাকেন, তা' হ'লে আপনারা জীবনের একটি আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ভবিষ্যতে যেখানে এই ছবিখানিকে দেখবার সুযোগ পাবেন, সেইখানেই দেখে নিয়ে আমাদের জানাবেন, আমাদের কথা সত্যি কিনা? এমিল্ জেনিংস্‌কে merry mood-এ দেখা, সে এক অভাবনীয় ব্যাপার! "তিনশো পঁয়ষট্টি স্ত্রী নিয়ে আমার বড় নিঃসঙ্গ বোধ হয়, এর থেকে একটি স্ত্রী ঢের ভালো"—জার্মান এমিল্ জেনিংস্-এর মুখে এর ইংরাজী কথা যে কী মিষ্টি, তা' যিনি না শুনেছেন, তাঁকে বুঝিয়ে বলবার উপায় নেই।

এই ফরাসী ছবিখানি গল্পের নূতনত্বে, দৃশ্যসংস্থানে, বিচিত্র ফোটোগ্রাফী কৌশলে এবং সর্ব্বোপরি বিস্ময়করভাবে সুন্দর আবহ-সঙ্গীতে এমনই এক অভিনব সৃষ্টি যে, এর জুড়ী কখনও দেখেছি ব'লে মনে পড়েনা। হলমুখ-ফিল্ম কোম্পানী (ছবিখানির ভারতীয় প্রচারক) এমন একখানি সুন্দর ছবি সাধারণ্যে দেখিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন।

•

রাধা ফিল্ম কোম্পানীর অংশীদারদের নাম হচ্ছে—শেঠ রাধাকিষণ চামেরিয়া, শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত এ, এন্. সিংহনিয়া। এঁরা বর্ত্তমানে ইণ্ডিয়া পিক্‌চার্স লিমিটেডের ম্যানেজিং এজেন্টস্ রূপে নিযুক্ত হয়েছেন। রাধার আফিস সংপ্রতি চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থ ভারত-ভবনের সুবিস্তৃত তৃতীয় তলে স্থানান্তরিত হয়েছে।

•

ইণ্ডিয়া পিক্‌চার্স লিমিটেডের ডিরেক্টার-বোর্ডে আছেন—শেঠ রাধাকিষণ চামেরিয়া, রায় বাহাদুর মোতিলাল চামেরিয়া, শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত এ, এন্. সিংহনিয়া প্রভৃতি। এই নূতন কোম্পানীটি এখন থেকে রাধা ফিল্ম কোম্পানীর সমস্ত চিত্রের নির্ম্মাণ, প্রচার এবং প্রদর্শনীর কাজ চালাবেন এবং উপরন্তু বিভিন্ন ভারতীয় কোম্পানীর তোলা কথা-ছবির একমাত্র প্রচারক (Sole Distributors) হিসেবে কাজ করবেন।

•

"রাজনটী বসন্তসেনা"র বাঙলা সংস্করণের শুটিং দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে।

•

শ্রীযুক্ত জোতিশ বন্দ্যোপাধ্যায় "দক্ষযজ্ঞে"র বাঙলা সংস্করণের সম্পাদনা শেষ ক'রে হিন্দী সংস্করণটিতে হাত দিয়েছেন।

•

এই শনিবার থেকে ক্রাউনে কালী-ফিল্মসের সুখ্যাত কথাছবি "বিল্বমঙ্গল" দেখানো হবে। এই ছবিখানি এমনই চমৎকার উপভোগ্য হয়েছিল যে, আমাদের মনে হয়, বহু লোকই অনেক দিন বাদে ছবিখানিকে আবার দেখবার সুযোগ পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠবেন। জানিয়ে রাখা ভালো, মাত্র এক হপ্তার জন্যে "বিল্বমঙ্গল" ক্রাউনে আস্‌চে।

•

আমাদের অদৃষ্টে অরোরার "নিয়তি" দেখা ঘটে উঠলো না। ছবিখানির "সগৌরবে দ্বিতীয় সপ্তাহ" বিজ্ঞাপিত হওয়ায় আমরা আশান্বিত হয়ে উঠেছিলুম। কিন্তু বিধি বাম। মধ্যপথে বিরাম পড়ল—বুধবার থেকে রূপিটারে অন্য ছবি দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে। অতএব———আমরা নীরব থাকতে বাধ্য হলুম এই নীরব ছবি সম্বন্ধে।

•

প্যারামাউন্টের একখানি ছবি আসছে—Cleopatra! প্রযোজনা করেছেন—সিসিল মিলি। প্রধান ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন কুশলী চরিত্রাভিনেত্রী ক্লডেট্ কলবার্ট।

এই ছবিখানি উপযুক্তরূপে আড়ম্বরপূর্ণ ক'রে তোলবার জন্যে সিসিল মিলি যে আয়োজন করেছেন, তা সামান্য নয়। Cleopatra ছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে এক অসামান্য রমণী। তাঁর সময়কার ঐতিহাসিকতা, তাঁর সময়কার ফ্যাসন, তাঁর সময়কার জীবনযাত্রাপ্রণালীকে ঠিকমতো আয়ত্ত করতে সিসিল মিলি অনন্যসাধারণ পরিশ্রম করেছেন।

Cleopatra যে বিখ্যাত বজ্‌রাখানি চ'ড়ে অ্যান্টনির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, হুবহু সেই রকম একখানি বজ্‌রা তৈরী করা হয়েছে। ক্লিওপেট্রার বজ্‌রাখানির যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে জানা যায়, সে বজ্‌রার দৈর্ঘ্য ছিল ৪০০ ফিট; চার হাজার লোক তাতে চড়তে পারতো; পাঁচশো দাঁড় তার দু'পাশে লাগানো; সেই পাঁচশো দাঁড় খাঁটি রূপার তৈরী; হালি যেখানে দাঁড়াতো, সেখানে রোদ-বৃষ্টি থেকে তার মাথা রক্ষার জন্যে সোনার বস্ত্রাতপ ঝুলতো।

সুতরাং এই বজ্‌রার নকল তৈরী ক'রতে প্যারামাউন্ট কোম্পানীকে যে প্রভূত অর্থ ব্যয় করতে হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি!

ক্রাউনে "চাঁদসদাগরের" পালা শেষ হ'ল ; কর্ত্তারা আটাশ হপ্তা একে সজোরে ক্রাউনের পর্দ্দায় আটকে রেখে "চণ্ডীদাসে"র রেকর্ড ভাঙার কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

সঙ্গীতের অমর্য্যাদা

(শ্রীগজেন্দ্রনাথ মিত্র)

গত পূর্ব্ব সপ্তাহে ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউট-এ বাৎসরিক সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা শুনলুম এবং মর্ম্মাহত হ'লুম।

বাঙ্গলা দেশে সঙ্গীতচর্চ্চার বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতচর্চ্চার অধঃপতন ঘটছে কিছুদিন থেকেই—কিন্তু এতদূর নীচে নেমে এসেছে, তা বুঝিনি। গান শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল বার বার যে, এঁদের মধ্যে অনেকেরই এখন সঙ্গীতের অ আ ক খ শেখবার সময় উত্তীর্ণ হয়নি, অথচ এঁরা নেমেছেন প্রতিযোগিতায়। অল্পবিস্তর বেসুরো বা বেতালা ত অনেকেই ; এমন কি শ্রেণীবিভাগ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ মাথায় ঢোকেনি। গজল, বাউল কিংবা ভজন—এ বিষয়ে একাধিক ভদ্রলোকের দেখলুম ধারণা খুব স্পষ্ট নয়।

পয়সা ক'মে এসেছে দেশে ; বড় ওস্তাদকে দিয়ে গান শিখতে গেলে তিনি যা মাইনে চাইবেন, তা হয়ত ছেলের বাবার একমাসের উপার্জ্জন ; তা ছাড়া তাতে সময়ও যায় অনেক। তাই বাংলা দেশ মাঝারি ধরণের বেশ একটা ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছে। মেয়েদের জন্ত এক প্রকারের ওস্তাদ গজিয়েছেন, যাঁরা তিন চার টাকা মাইনেতে মাসের সব ক'টা দিন বাজোর যত রেকর্ডের গান শুনে এসে সেইগুলো শেখাতে থাকেন। গলা সাধবার বালাই নেই (সাধাতে গেলে বোধ হয় চাকরীও থাকবে না) ; বেসুরো এবং বেতালা হ'লেও প্রতিবাদ করেন না। মেয়ের বাপেরা এই আত্ম প্রসাদে মগ্ন থাকেন যে, মেয়েদের তাঁরা ভাল গাইয়ে তৈরী করছেন এবং আশা করেন যে, এইতেই তাঁর রূপোর এবং অনেক সময়ে রূপেরও, দৈন্ত ঢাকা পড়বে। যত বাড়ীতে আমার গতিবিধি আছে বা কাণে যা এসে পৌছয়, শতকরা পঁচানব্বইটী বাড়ীতেই মেয়েদের গান শেখাবার এই ব্যবস্থা। লিখতে লিখতে শুনতে পাচ্ছি, সামনের বাড়ীর মেয়েটী এমন সব গান অভ্যাস করছে, যা শুনলে কুমার শচীন দেববর্ম্মণ বা ধীরেন দাসের আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করবে।

আর ছেলেরা? তাদের জন্ত সস্তার মুাজিক স্কুল আছে, নয়ত সস্তা-দরের 'খানিকটা' ওস্তাদ আছে। সত্যিকারের ভালো ওস্তাদের কাছেও কেউ কেউ যায় বটে, কিন্তু বেশীদিন টিঁকতে পারেনা ; বোধাই অবধি পৌছেই গানের আসরে বিলিতী ডিক্রী দাবী করে। পূর্ব্বোক্ত সস্তা দরের স্কুল বা ওস্তাদরা ঠিক ছাত্রদের মেজাজ জানেন ; দিনকতক গলা সাধাবার পরেই একেবারে ধ্রুপদ খেয়াল, টপ্পা ঠুংরী শেখাতে আরম্ভ করেন এবং বৎসর খানেকের মধ্যেই তারা গানের আসরে বড় গাইয়ে হয়ে ওঠে এবং ওদের আবার ভক্তদলও দেখা দেয়। তার ওপর ছদিন রেডিওতে গাইলে বা ছএকখানা দেশী কোম্পানীতে রেকর্ড উঠলেত আর কথাই নেই!

গান জিনিষটাকে এইভাবে খেলো করার জন্ত আমাদের রেডিও বা গ্রামোফোন কোম্পানীরা কম দায়ী নয়। যেহেতু সরকার বাহাদুর ব্রডকাষ্টিং-এ বেশী টাকা দিতে প্রস্তুত নন, সেহেতু তাঁরা অল্প খরচে বা বিনা খরচে ছনিয়ার যত তথাকথিত গাইয়েকে প্রশ্রয় দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। কৃষ্ণ দে, পঙ্কজ মল্লিক, গোঁসাইজী প্রভৃতির নাম দেখলে আজকাল মনে হয় রেডিও কর্ত্তৃপক্ষ হঠাৎ ভুলে এঁদের নাম দিয়ে ফেলেছেন। ঐ সব 'খানিকটা' গাইয়ে আবার গেয়েই নিশ্চিন্ত ন'ন ; ছদিন গাইবার পরই স্বরচিত বা বন্ধুবান্ধবরচিত গানে সুর-সংযোজনা ক'রে আত্মগরিমা লাভ করেন ও গীতি-লক্ষ্মীর গালে চুনকালী লেপন করেন।

গ্রামোফোন কোম্পানীরাও তাই! বিদেশী কোম্পানীর হাতে যখন একচেটে হয়েছিল ঐ ব্যবসায়, তখন তাঁরা বরং গুণী লোককে খুঁজে আনত—এবং ভাল রেকর্ড তোলবার জন্ত টাকা খরচ করত। দেশী কোম্পানীর মালিকদের নিজেদের, আত্মীয়দের এবং বন্ধুবান্ধবদের অনুগত 'খানিকটা' গাইয়ের অভাব নেই। টাকা ওঁদের যথাসম্ভব কম দেওয়া চলে, এমন কি অনেককে না দিলেও ক্ষতি নেই। রবীন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রকুমার বা নজরুল—এঁদের গান নিতে গেলে অনেক পয়সা খরচ। তার থেকে ক্ষুদে কবিদের কৃতার্থ করা ঢের সহজ। তাঁরাও ফরমাস মত আইন বাঁচিয়ে ওঁদের অনুকরণ করেন ; কখনও বা রবীন্দ্রনাথের লাইনের সঙ্গে হেমেন্দ্র-কুমারের লাইন এবং হেমেন্দ্রকুমারের লাইনের সঙ্গে নজরুলের লাইন মিশিয়ে গান সর্ব্বজনপ্রিয় হোল মনে ক'রে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে থাকেন। সুর ত কথাই নেই. বেমালুম রবীন্দ্রনাথের সুরবৈশিষ্ট্যকে সাধারণ বা অসাধারণ ভাবে আত্মসাৎ করা কিংবা কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়া সুরের সঙ্গে নজরুলের সুর মিশিয়ে চালিয়ে দেওয়া ত নিত্যই চলছে। অসাধারণ ভাবে কথার অর্থ হচ্ছে এই যে, কোনও কোনও বিখ্যাত গানকে শুধু লাইন বদলে নেওয়া হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, সম্প্রতি আঙ্গুরবালার একটী রেকর্ড শুনছি (বেশীর ভাগই সিনেমায়), যা অবিকল "একদা তুমি প্রিয়ে"'র সুর। স্থানাভাবে বেশী দৃষ্টান্ত দিলুম না।

অনুকরণ করার চার্জ্জ-এর উত্তরে যদি কেউ বলেন যে, নজরুলও যেমন পাঁচটা রাগিণী মেলান, আমিও তাই করি ; সুতরাং এর মধ্যে অনুকরণ কি ক'রে হয়—তা'হ'লে তার উত্তর এই যে, সেই রাগিণী সংমিশ্রণের মধ্যে একটী বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে এবং সেই বৈশিষ্ট্যটীকেই এই ব্যর্থ অনুকরণের ভিতর পাওয়া যায় না। বর্ণপরিচয়ের ঐ ছত্রিশ অক্ষর নিয়েই ত যত কিছু সাহিত্য ; সুতরাং তার অনুকরণই বলুন আর অনুসরণই বলুন, সমস্তই ঐ বৈশিষ্ট্যকে নিয়েই।

সঙ্গীতের ভাষা ও সুরের সম্বন্ধে এই ব্যভিচারের ফলেই তথাকথিত ওস্তাদের মাসিক তিন টাকা মাইনেতে ট্যুইশন করতে হয়, আর মজলিশে গেলে পেয়ালা কয়েক জোলো চা আর বিড়ি ছাড়া বিশেষ কিছুই মেলেনা।

অপরেশচন্দ্র

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

সিরাজদ্দৌলা নাটকের অভিনয় এবং প্রচার বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, এই নাটকের প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের নাম জানিবার নিমিত্ত অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁহাদের প্রীতির নিমিত্ত নিম্নে অধিকাংশ নামই লিখিত হইল :—

সিরাজদ্দৌলা—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)। মীরজাফর খাঁ—নীলমাধব চক্রবর্ত্তী। মীরণ - শ্রীকুটবিহারী মিত্র। সকতজঙ্গ—শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)। মোহনলাল—তারকনাথ পালিত। জগৎশেঠ—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ। মীরমদন—৺নীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টুবাবু)। উমিচাঁদ—শ্রীহরিদাস দত্ত। করিমচাচা—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। দানসা—অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। ক্লাইভ—শ্রীক্ষেত্রমোহন মিত্র। হলওয়েল ও ওয়াট্‌স্—অটলবিহারী দাস। জহরা—শ্রীমতী তারাসুন্দরী। আলিবর্দ্দী-বেগম—ঐ (পর সপ্তাহ হইতে হেমন্তকুমারী)। ঘসেটি-বেগম ও ওয়াট্‌স্-পত্নী—শ্রীমতী সুধীরাবালা (পটল)। আমিনা বেগম—শ্রীমতী ভূষণকুমারী (ছোট)। লুৎফউন্নিসা—সুশীলাবালা। উমৎ জহরা—সুবাসিনী।

শিক্ষক—গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।

সঙ্গীত-শিক্ষক—শশীভূষণ বিশ্বাস ও তারাপদ রায়।

নৃত্য-শিক্ষক—শ্রীসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়।

রঙ্গভূমি-সজ্জাকর—কালীচরণ দাস।

অপরেশচন্দ্রের ষ্টার থিয়েটারে যোগদান

মিনার্ভা থিয়েটার পরিত্যাগ করিয়া অপরেশচন্দ্র তাঁহার বাল্যবন্ধু সুরেন্দ্রনাথ রায়ের সহিত মিলিত হইয়া কিছুদিন মফঃস্বলে গিয়া কনট্রাকটারী কার্য্য করেন। প্যাণ্ডোরা থিয়েটারের উল্লেখ সময়ে পাঠকগণ সুরেন্দ্রবাবুর সহিত পরিচিত হইয়াছেন। কনট্রাক্টারী কার্য্যে সুবিধা না হওয়ায় পুনরায় তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। সে সময়ে মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশ-চন্দ্রের "মীর কাসিম" নামক নূতন ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয় চলিতেছে। (প্রথমাভিনয় রজনী—১৬ই জুন, ১৯০৮ খ্রীঃ, ২রা আষাঢ়, ১৩১৩ সাল।)

অপরেশচন্দ্র তাঁহার 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"মিনার্ভায় মীর কাশেমের যখন চতুর্থ কি পঞ্চম রজনীর অভিনয় চলিতেছে, সেই সময়ে আমার অকৃত্রিম সুহৃদ্ সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কালী কুমার আমাকে ষ্টারে লইয়া যান। আমি গিয়া দেখি, ষ্টারে ক্ষীরোদ-বাবুর "পলাশীর প্রায়শ্চিত্তের" রিহার্স্যাল চলিতেছে। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নূতন নাটক লিখিয়া অভিনয় করার দুঃসাহস ষ্টারের বোধ হয় এই প্রথম। যখন মিনার্ভায় মীর কাশেমের ষষ্ঠ অভিনয়, সেই সময় ষ্টারে পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত খোলা হইল। * * ষ্টারে মীর কাশেম সাজিয়াছিলেন—স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র। সিংহ স্থবির, রোগ-জীর্ণ, কিন্তু তবু সেই বৃদ্ধ কেশরী পলাশীর প্রায়শ্চিত্তে মাঝে মাঝে যে বিদ্যুতের চমক দিতেন, তাহাতে দর্শকের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিত। **পলাশীর প্রায়শ্চিত্তের মীর কাশেম-ই অমৃতলালের নূতন নাটকে শেষ ভূমিকা গ্রহণ।** প্রথম ষ্টারে গিয়া আমি তাঁহার সহিত এই নাটকে একটি ছোট ভূমিকা অভিনয় করিবার সৌভাগ্যলাভ করি; আমি সাজিয়াছিলাম "মোহনলাল"। এই প্রথম পরিচয় হইতে আমি অমৃতলালের নিকট যে অমায়িক ব্যবহার, যে উৎসাহ, যে প্রীতি, যে স্নেহ লাভ করিয়াছিলাম, তাহা আমার এই ক্ষুদ্র নট-জীবনে দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

প্রায় আটমাস অপরেশচন্দ্র ষ্টার থিয়েটারে অবৈতনিক (amateur) ভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার বাল্যবন্ধু ৺শরৎকুমার রায় ৺গোপাললাল শীলের এমারেল্ড থিয়েটারের বাড়ী, ১৩১৪ সাল, বৈশাখ মাসে হাইকোর্টের প্রকাশ্য নীলামে খরিদ করিয়া থিয়েটার চালাইবার সঙ্কল্প করেন। অপরেশবাবু ষ্টার থিয়েটার ছাড়িয়া দিয়া শরৎবাবুর সহিত মিলিত হন।

(ক্রমশঃ)
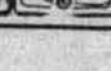
সর্ব্বসাধারণের বিশেষ অনুরোধে　　শনিবার ২৯শে সেপ্টেম্বর হইতে

কালী ফিল্ম্‌সের

চিরনূতন ভক্তিমূলক সবাক চিত্র

বিল্বমঙ্গল

ক্রাউন টকী হাউস - - শ্যামবাজার, কলিকাতা

শনি ও রবিবার ... ৩টা, ৬-১৫ ও ৯-৩০ টা

অন্যান্য দিবস ... ৬-১৫ ও ৯-৩০ টা

শনি ও রবিবার তিনবার বেলা ৩টা, সন্ধ্যা ৬-১৫ ও রাত্রি ৯॥ টায়

অন্যান্য দিন দুইবার সন্ধ্যা ৬-১৫ ও রাত্রি ৯॥ টায়

৮৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, (শ্যামবাজার) কলিকাতা
টেলিফোন নং—১১৩৩ বড়বাজার

পঞ্চম সপ্তাহ শনিবার ২৯শে সেপ্টেম্বর হইতে

মহুয়া

মহুয়া

মহুয়া

অদৃষ্টপূর্ব্ব যে চিত্র দেখিবার জন্য সহরবাসী
গত ৪ সপ্তাহ ধরিয়া ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়াছে,
সেই অপূর্ব্ব মনোহর কথাচিত্র

মহুয়া আপনি যদি এখনও না দেখিয়া থাকেন—
তাহা হইলে অদ্যই দেখিয়া যান।

আপনাদের সুবিধার জন্য সকল শ্রেণীর টিকিট সকাল ৯টা হইতে পাইবেন।

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নাচঘর

[প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা] Regd. No. 1304. [বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা

১০ম বর্ষ
৩৬শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
সহকারী সম্পাদক—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

১৮ই আশ্বিন
১৩৪১

কলালাপ

রঙ মহলের নূতন সামাজিক "চিত্র" "বাঙ্‌লার মেয়ে" দেখে এলুম তৃতীয় রজনীতে।

*

"বাঙ্‌লার মেয়ে"র অভিনয় আমাদের ভালো লেগেছে। বইখানিতে কম ক'রে ছাব্বিশটি চরিত্র আছে, স্ত্রী এবং পুরুষ মিলিয়ে। কিন্তু শুনলে অবাক হবেন, এতগুলি চরিত্রের ভিতর একটীও কু-অভিনীত হয় নি ত' বটেই, বরং মাত্র দু-তিনটি ছাড়া প্রত্যেকটির অভিনয় হয়েছে নিখুঁত। এত বড়ো প্রশংসার কথা উচ্চারণ করবার সুযোগ হয় আমাদের খুব কম অভিনয় সম্বন্ধেই।

*

যে দু'-তিনটি চরিত্রের অভিনয়ে আমরা অল্প-বিস্তর খুঁত দেখতে পেয়েছি, তাদের কথাই আগে বলি। শ্রীঅমর বসু 'সুবিনয়বাবু'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে একটি মাত্র দৃশ্যের অভিনয়ের ভিতর দিয়েই দর্শকদের মনে বেশ একটি ছাপ রেখে যান। তবু তাঁকে বলছি, ওই একটি মাত্র দৃশ্যেই তাঁর অভিনয়-ভঙ্গী হয়ে পড়েছে দু'রকমের। গোড়ার দিকে (বোধ হয় বীথি এবং সরলা গঙ্গা নেয়ে ফিরে আসবার আগে পর্য্যন্ত) তাঁর অভিনয় দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি 'চিরকুমার সভা'র চন্দ্রবাবুর ভূমিকায় শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়-ভঙ্গীকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বরাবর তিনি এই ভঙ্গীটাকে বজায় রাখতে পারেন নি; শেষের দিকে তাঁর অভিনয় হয়ে পড়েছিল তাঁর নিজের মতই এবং তাতে পেয়েছি 'পতিব্রতা'র সনাতনের ছায়া। একটি মাত্র দৃশ্যের অভিনয়ে এমন ধারা সমতা বা uniformity-র অভাব বাঞ্ছনীয় নয়। অমরবাবুর মত অভিনেতার এই ত্রুটী সংশোধন ক'রতে বেশী দেরী লাগবে না, এই বিশ্বাস আছে ব'লেই আমরা বন্ধুভাবে এর উল্লেখ করলুম।

শ্রীমতী রাগিণী দেবী

*

"ইলা"র ভূমিকাভিনেত্রী শ্রীমতী রেণুকার সম্ভবতঃ এই প্রথম মঞ্চাবতরণ। এবং এই একমাত্র কারণেই তাঁর কণ্ঠ এবং দেহ—দুইই এখনও পর্য্যন্ত জড়তামুক্ত হ'তে পারেনি। তাঁকে লক্ষ্য ক'রে দর্শকরা প্রায়ই ব'লতে বাধ্য হচ্ছিলেন—'Louder please.' কিন্তু তাঁর এই আড়ষ্টভাবটুকু বাদ দিয়ে দেখলে তাঁকে প্রশংসাই ক'রতে হয়। 'ইলা'র চরিত্রের মৃদুতা, কমনীয়তা ও সহজ-শ্রী তাঁর অভিনয়ের ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছিল এবং প্রথম রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ ক'রে এতটা সাফল্যলাভ করা কম বাহাদুরীর কথা নয়।

*

শ্রীমতী রেণুবালা (সুখ) 'ভবানী'র দুঃখিনী মূর্ত্তিকে খুব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ ক'রতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু তা' করবার জন্যে যে-ধরণের

আবৃত্তিকে তিনি অবলম্বন করেছেন, তাকে বড্ড বেশী মামুলি বা stereotyped ব'লে মনে হয়। আমরা অনেকদিন ধ'রেই দেখে আস্‌ছি, দুঃখব্যঞ্জক কথা কইতে গেলেই তিনি এক অস্বাভাবিক ধরণের সুরেলা আবৃত্তির সাহায্য নেন। এটা প্রায় তাঁর অভ্যেসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে এবং এর থেকে তাঁর মুক্ত হওয়া দরকার।

*

—ব্যস, উপরের এই তিনজন ছাড়া আর প্রত্যেকের অভিনয় হয়েছে চরিত্রসঙ্গত, উপভোগ্য এবং নিখুঁত। আর একটা বড়ো কথা।—কারুরই অভিনয় অন্য কারুর অভিনয়ের সঙ্গে শত্রুতা ক'রে ছন্দভঙ্গ করেনি। সকলেরই অভিনয় চলেছে সমতালে; সমস্ত অভিনয়টি একটি সুরে বাঁধা। অথচ কত না বিরোধী চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে এই বইখানিতে। মাত্র উপেন্দ্রনাথ, দেবী, বীথি এবং ভবানী—এই চারজনের চিন্তাধারার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে; তা'ছাড়া আর সব ক'টি চরিত্রেরই ভাবনা, কার্য্যপ্রণালী এবং বাহিরের মূর্ত্তি ঠিক যেন পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করছে। (এত রকম এবং এত বেশী চরিত্রের অভিনয়ের মধ্যে একটি শুদ্ধ ছন্দ-তাল-মাত্রা-সমন্বিত সঙ্গতি রাখা রীতিমত দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু "রঙ্‌মহলে"র নাট্যশিক্ষক ও প্রয়োগশিল্পীরা এই দুঃসাধ্য ব্যাপারকেই সুসাধ্য ক'রে তুলেছেন অবলীলাক্রমে এবং এর জন্যে আমরা তাঁদের প্রশংসা করছি মুক্তকণ্ঠে।

*

প্রত্যেকটি ভূমিকাই যেখানে সুঅভিনীত হয়েছে, সেখানে অমুকের চেয়ে অমুক ভালো অভিনয় করেছেন বা অমুকের অভিনয় হয়েছে সর্ব্ব প্রথম এবং অমুকের হয়েছে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ—এমন সব কথা বলবার সুযোগ কোথায়?) নায়ক 'সত্যেন্দ্রনাথ' বেশে শ্রীরতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে-কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন, একটিমাত্র দৃশ্যে ছোট্ট চরিত্র 'কুঞ্জলালে'র ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় কি তার থেকে কম শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন? 'মায়া ব্যানার্জ্জি'র প্রকাণ্ড বড়ো চরিত্রে অবতীর্ণ হয়ে শ্রীমতী শান্তি যতখানি নাটনিপুণতা দেখিয়েছেন, শ্রীমতী আসমানতারা কি তার থেকে কিছু কম দেখিয়েছেন নটবর দাসের মেয়ে 'শান্তি'র অপেক্ষাকৃত অনাড়ম্বর ভূমিকায়? যিনি যে-চরিত্রে দেখা দিয়েছেন, তিনিই সেই চরিত্রের উপযোগী সুন্দর অভিনয় ক'রতে অপারগ হন নি; কাজেই সত্যেন্দ্রনাথ থেকে সুরু ক'রে মলিনা পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি চরিত্রের অভিনয়ই হয়েছে প্রথম শ্রেণীর (উপরের তিনটি ছাড়া) এবং এই প্রথম শ্রেণীর মধ্যে দাগ দিয়ে দিয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি মার্কা দেওয়া হবে অরসিকের কাজ। কাজেই আমরা সে চেষ্টা করব না।

*

এক একখানি বইয়ে একটি বা দুটি চরিত্র নানা দিক দিয়ে বেশী ক'রে প্রাধান্য লাভ ক'রে আমাদের মনের মধ্যে কিছু অতি-মাত্রায় গভীর রেখাপাত করে। এবং আলোচ্য "বাংলার মেয়ে"তেও সেই ধরণের একটি বিশিষ্ট চরিত্র আছে। সেটি হচ্ছে "মিসেস্ মায়া ব্যানার্জ্জি"। এই চরিত্রটিই "বাংলার মেয়ে"র ভিতরে যে নাটক আছে, তার মূলশক্তি বা moving force. সারা বইটিকে ছেয়ে রয়েছে এই চরিত্র। তার উপর চরিত্রটির মধ্যে নূতনত্ব রয়েছে যথেষ্ট; এ-ধরণের ইঙ্গ-বঙ্গমহিলার চরিত্র সচরাচর বাঙলা নাটকে দেখা যায় না। শিক্ষিতা, আধুনিক রুচি-সম্পন্না, আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানবিশিষ্টা, ভগবানে বিশ্বাসহীনা, তেজস্বিনী, আত্মশক্তিতে বলবতী মায়া ব্যানার্জ্জির ছবি বাঙলা রঙ্গমঞ্চে নতুন। আন্তরিকতা তার চরিত্রের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ। She is sincere in her belief and action. শেষ দৃশ্যে 'দেবী' মৃত্যুশয্যায়, মায়া তার ঘরে ঢুকে বলছে,—একি, ভুঁয়ে ফেলে রেখেছে রুগীকে, এর নাম চিকিৎসা?—রুগী থেকে সুরু ক'রে সবাই জানছে, তার মৃত্যু আসন্ন, কিন্তু একা মায়া তা' মেনে নিতে পারছে না; বলছে—"আমি তোমায় বাঁচাব"। তার বিশ্বাস,—সেবায় শুশ্রূষায়, ডাক্তারের ওষুধে সে তাকে বাঁচাতে পারবে,—মানুষকে বাঁচাবার জন্যে এর বেশী আর কিছুর আবশ্যকতা আছে, সে চিন্তা তার মনে স্থান পায়না। পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা পূর্ণ প্রভাবিত একটি চমৎকার ভালো মেয়ে হচ্ছে এই মায়া ব্যানার্জ্জি। —এই কঠিন চরিত্রটি'কে রূপদান করেছেন শ্রীমতী শান্তি। এই ধরণের চরিত্রাভিনয়ের মুস্কিল হচ্ছে এই যে, একটু-ওদিক হয়ে গেলে, সামান্য-মাত্র balance হারালেই অভিনয় হবে ব্যর্থ, অভিনেত্রী হবেন উপহাসাস্পদ। কিন্তু শ্রীমতী শান্তি এমনই সংযমের সঙ্গে, এমন চমৎকার গাম্ভীর্য্য ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে তাঁর বাচনে, গতিভঙ্গীতে এবং অঙ্গবিক্ষেপে শ্রীমণ্ডিত ক'রে এই চরিত্রটিকে রূপায়িত করেছেন যে, আমরা তাঁকে সংখ্যাতীত সাধুবাদ না জানিয়ে পারছি না। অবশ্য একথা না বল্‌লে অন্যায় হবে যে, তাঁর গৃহীত চরিত্রটিকে যথোচিত মর্য্যাদাদান করবার জন্যে তাঁর দেহসৌষ্ঠব অল্প সাহায্য করেনি। 'মিসেস্ মায়া ব্যানার্জ্জি'কে আমরা ভুলতে পারব না কোন দিনই। এবং সারা বইখানির ভিতর এই একটি মাত্র চরিত্র ছাড়া আর কারুর কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করবার প্রয়োজন নেই।

*

("বাংলার মেয়ে"কে নয়নাভিরাম করবার জন্যে "রঙ্‌মহল" যে আয়োজন করেছেন, তাও অভাবনীয়। পাত্রপাত্রীদের পোষাক-পরিচ্ছদে এবং মঞ্চসজ্জায় চারু-শ্রীকে বিকসিত করবার এমন সর্ব্বাঙ্গীন প্রচেষ্টা তাঁরা "মহানিশা" বা "পতিব্রতা"তেও করেন নি। অবশ্য এইখানে আমাদের একটা কথা বলবার আছে। তাঁরা সামাজিক নাটকের অভিনয়ে প্রত্যেক দৃশ্যকে এমন ভাবে সাজান যে, দেখে মনে হয়, তাঁরা চান প্রতিটি দৃশ্যকে যতদূরসম্ভব বাস্তব বা realistic ক'রতে। কিন্তু এদিক দিয়ে তাঁদের চেষ্টা বরাবরই ব্যর্থ হয়ে আসচে।) আজও পর্য্যন্ত তাঁরা এমন কোন দৃশ্যই মঞ্চের উপর খাড়া ক'রতে পারেন নি,—সে 'মহানিশা'য় মুরলীধরের কক্ষই হোক্, আর 'এই বাংলার মেয়ে'তে মিঃ ব্যানার্জ্জির দ্বিতলের বারান্দাই হোক্—যাকে দর্শকরা বাস্তব জগতের জ্যান্তো জিনিষ ব'লে মনে ক'রতে পেরেছে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি এই 'বাংলার মেয়ে' থেকেই। 'উপেনের বাড়ীর দাওয়া'র দৃশ্যে কৃত্রিম ঘরের চালের উপর সত্যি সত্যি লাউগাছ ঝোলানো চালের কৃত্রিমতাকে কি বেশী ক'রে প্রকাশ করে নি? এর চেয়ে কৃত্রিম লাউগাছ যদি তাঁরা ওখানে তৈরী ক'রতে পারতেন, তা'হ'লে ঢের ভালো হ'ত। কিন্তু থাক্ এই পর্য্যন্ত। Realistic settings নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা করা যাবে ভবিষ্যতে। হাঁ, আর একটি খুঁতের কথা উল্লেখ করি—এটি হচ্ছে অঙ্গ-সজ্জার। বীথি-বেশী শ্রীমতী শেফালিকা তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আবির্ভূত হন মাথার উপরে চুলের ঝুটি জড়িয়ে—অজুহাত, গঙ্গাস্নান ক'রে ফিরেচেন। আমরা বহু বাঙালী হিন্দু কুমারীকে গঙ্গাস্নান ক'রে বাড়ী ফিরতে দেখেছি; হয়, তাদের চুল এলানো থাকে, নয় থাকে মাথার পেছন দিকে জড়িয়ে বাঁধা—মাথার উপরে নয়। শ্রীমতী শেফালিকা যেভাবে চুলকে বেঁধেছিলেন, সেভাবে বাঁধবার ধরণ বারাঙ্গনাদের মধ্যেই প্রচলিত আছে, ভদ্রঘরের কুমারীদের ভিতর নেই। ওটা বড় দৃষ্টিকটু, ওর সংশোধন আবশ্যক। ছোট্ট ত্রুটী, কিন্তু চক্ষুপীড়াদায়ক।

*

এইবার "বাংলার মেয়ে" বইয়ের কথা। আমরা শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর "পথের শেষে" উপন্যাস পড়িনি। কাজেই 'বাংলার মেয়ে"কে গড়বার সময় শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী তাঁর উপন্যাসকে যথাযথভাবে ব্যবহার ক'রতে পেরেছেন কি না, সে-বিচার আমরা আপাততঃ ক'রতে পারছি না। "বাংলার মেয়ে'কে আমরা একখানি আনকোরা নতুন বই হিসেবেই দেখিছি। এবং সেই হিসেবেই আমরা এর সম্বন্ধে হু'চারটি কথা বল্‌ব। আমরা গোড়াতেই বইখানিকে "সামাজিক চিত্র" নামে অভিহিত করেছি—নাটক বলিনি। এবং দেখছি, রঙ্‌মহলও একে তাই-ই বলতে চেয়েছেন; কারণ তাঁরা "বাংলার মেয়ে"র বিজ্ঞাপনে বলেছেন—"বাংলার মেয়ে জননীরূপে—স্নেহধারায় অভিষিক্ত করিবে, মাতারূপে - অনুকম্পাভরে পালন করিবে, পত্নীরূপে—সর্ব্বস্ব দিয়া ভালবাসিবে এবং হিংসাপরায়ণা শ্বা(?)শুড়ীরূপে জীবন বিষময় করিয়া তুলিবে।"

*

আমরা "বাংলার মেয়ে"কে নাটক নামে সম্মানিত ক'রতে পারলুম না। পুরো ছ'টি ঘণ্টা ধ'রে এর অভিনয় দেখবার পর আমাদের ফিরে ফিরে এই কথাই মনে হচ্ছে, এর ভিতরকার অত বড়ো নাট্যবস্তুকে যোগেশবাবু অত সহজে উপেক্ষা ক'রে গেলেন কিসের মোহে? বাঙলার মেয়ের দুঃখের জীবন দেখাতে হবে, এই মোহটা এত বড়ো হ'ল যে, তার জন্যে নাটকটিকে টুঁটি টিপে মারতে তাঁর একটুও বাধল না? নাটকটিকে যদি তিনি বড়ো ক'রে দেখতেন, তা'হ'লে তিনি এর নাম "বাংলার মেয়ে" না দিয়ে দিতেন—"বাংলার ছেলে"; কারণ সত্যেন্দ্রনাথই হচ্ছে বইটির Chief protagonist. "বাংলার মেয়ে"র ভিতর আসল নাটক কোথায়, তাই তিনি ধ'রতে পারেন নি, এত বড়ো অপবাদ তাঁর স্কন্ধে নিক্ষেপ ক'রতে আমাদের অন্তর সঙ্কোচ অনুভব করছে।

*

"বাংলার মেয়ে" আসলে হচ্ছে একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকের মর্ম্মভেদী জীবন-নাট্য বা ট্রাজিডি। এর মূল সুর বা বক্তব্য (theme) হচ্ছে—উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং পরিবেশের মাঝে সংঘর্ষ—the clash between ambition and environment. সত্যেন্দ্রনাথ একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক; তার আশা অসীম; সে সামান্য অবস্থার ভিতরে প'ড়ে থাকতে চায় না। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হয়ে সে নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যে স্ত্রীর গহনা বিক্রীর টাকায় এম্‌-এ প'ড়তে দ্বিধা বোধ করে না; তথাকথিত আধুনিকতার বিরোধী হয়েও 'সাহেব' দাদা-বৌদির অনুগ্রহপ্রার্থী হ'তে কুণ্ঠিত হয় না; বিলাত যাবার সুবিধার জন্যে সরলা নারীর কাছে মিথ্যাচারী হ'তে লজ্জা অনুভব করে না; নিজের দেবতুল্য পিতা এবং সোনার পুতলী স্ত্রীর বুকে শেলাঘাত ক'রতেও কেঁপে ওঠেনা।—কিন্তু যখন তার অভীষ্ট সিদ্ধ হ'ল, সে সত্যিই দশজনের একজন ব'লে নিজেকে মনে ক'রতে পারলে, তখন চোখ মেলে সে দেখলে—নিজের ইচ্ছাপূরণের জন্যে কতখানি মূল্য দিতে হয়েছে তাকে; মদের দুর্নিবার লোভে সে অমৃতকে হারিয়ে ব'সে আছে; মিথ্যা মরীচিকার পিছনে ছুটে সত্যকে সে দিয়েছে জলাঞ্জলি; দুর্ল্ভ কাঞ্চন মূল্যে সে সুলভ কাচকে ক্রয় ক'রে নিজেকে দিয়েছে পরম এবং চরম ফাঁকি।—"বাংলার মেয়ে"র ভিতর এইটুকুই হচ্ছে যথার্থ নাটক। কিন্তু এই নাটককে নিদারুণ ভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে বাঙলার মেয়ের দুঃখজীবনের শোভাযাত্রা দেখাবার 'মহত্তর এবং বৃহত্তর' চেষ্টায়। তাই প্রথম দু'টি অঙ্ককে সানন্দে উপভোগ করবার পর তৃতীয় অঙ্কের সুরু থেকে পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য পর্য্যন্ত রসিকচিত্তকে দুঃখভোগ ক'রতে হয় অবান্তরতা ঘূর্ণীপাকে প'ড়ে। তৃতীয় এবং চতুর্থ অঙ্কের কয়েকটি দৃশ্যে "বীথির" জীবন-সমস্যাটাই হয়ে উঠেছে বড়ো, যদিও সে সমস্যার সমাধান করবার কোন সন্তোষজনক চেষ্টা করা হয়'ন শেষ পর্য্যন্ত। বীথির সমস্যা নিয়ে অনায়াসেই একখানা পৃথক নাটক গ'ড়ে উঠতে পারত; ও জিনিষটা নিয়ে এত বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করবার খুব-বেশী আবশ্যকতা ছিল না এখানে। দজ্জাল শাশুড়ীর রূপ এবং ভবানীর শোচনীয় মৃত্যু দৃশ্য হিসেবে সাধারণের চিত্ত জয় করবার জন্যে খুব লোভনীয় হ'লেও অন্ততঃ রসের মুখ চেয়ে এ-লোভ সংবরণ করাই উচিত ছিল। পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটিকেও বজায় রাখবার সপক্ষে কোন যুক্তিই খুঁজে পাচ্ছি না। এ ছাড়া প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য থেকে সুরু ক'রে পঞ্চম অঙ্কের শেষ দৃশ্য পর্য্যন্ত স্থানে অস্থানে এত অবান্তর উক্তি আছে, যাদের পরিহার ক'রলে "বাংলার মেয়ে"'র শোভা বাড়বে বৈ কমবে না।

*

আর এক কথা।—যোগেশবাবু কি সংপ্রতি যাত্রার পক্ষপাতী হয়ে উঠছেন? নইলে একেবারে পুরোপুরি যাত্রার টেক্‌নিকে তিনি গানগুলিকে সন্নিবেশিত করেছেন কেন? যাত্রায় দেখা যায়, যখন যা ঘটনা ঘটছে, মাঝে মাঝে কারণে-অকারণে জুড়ীরা উঠে সেই ঘটনা অনুযায়ী গান সুরু ক'রে দেয়। "বাংলার মেয়ে"তেও তাই হয়েছে। গোড়াতেই যাত্রার প্রস্তাবনার অনুযায়ী সাদা পাঞ্জাবী-পরা দু'টি ছেলে (গেরুয়া রংয়ের চাপকান প'রলেই ব্যাপারটা নিখুঁত হ'ত) যবনিকা ঠেলে মঞ্চের একেবারে ধারে এসে দাঁড়িয়ে গান জুড়ে দেয়—"ওগো বাংলাদেশের মেয়ে"। অবশ্য এ-সবও নয় নির্ব্বিবাদে সহ্য করা চলে; কিন্তু পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে বিধবা কন্যার জন্যে দুঃখকাতর জিতেন্দ্রনাথের সামনে স্কুলে-পড়া বালিকা 'মলিনা'কে দিয়ে যখন 'বিধবা বাঙ্গালীর মেয়ে" গাওয়ানো হয়, তখন জিনিষটা রীতিমত সহ্যের সীমা অতিক্রম করে। সব বিষয়েই একটা মাত্রা জ্ঞান থাকা উচিত।—আমাদের আর একটি আপত্তি আছে। বইখানিতে ইংরেজী বুক্‌নির ছড়াছড়িটা একটু কমালেই ভালো হয়; যোগেশবাবু বা রঙমহলের কর্তৃপক্ষ দর্শকদের—পুরুষ এবং মহিলা,—দু'দলকেই হঠাৎ অকারণে এতখানি সাহেব মনে করেছেন কেন?

*

কিন্তু বই হিসেবে "বাংলার মেয়ে"'র ভিতর অগুন্তি ত্রুটী থাকা সত্ত্বেও এর অভিনয় হয়েছে যার-পর-নাই উপভোগ্য। তার ওপর রঙ্‌মহলের কর্তৃপক্ষ যে অপরূপ সাজে সজ্জিত ক'রে "বাংলার মেয়ে"কে আমাদের চোখের সামনে ধরেছেন, তা' আমাদের চোখকে করেছে তৃপ্ত, মনকে দিয়েছে খুশীতে ভরিয়ে। আমরা রঙ্‌মহলের কর্তৃপক্ষকে আমাদের অন্তর থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

*

নব-নাট্যমন্দিরের নবতম নিবেদন, মোগল-পাঠান-প্রণেতা শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত নূতন পৌরাণিক নাটক "সরমা"র উদ্বোধন-রজনীতে আমরা উপস্থিত ছিলুম।

*

দেখলুম, শিশিরকুমার তাঁর বহুকালের অভ্যাসকে পরিত্যাগ ক'রতে পারেননি। অত্যন্ত অপ্রস্তুত অবস্থায় কণ্ঠস্বরকে কণ্ঠ থেকে বিদায় দিয়ে তিনি মঞ্চাবতরণ করেছিলেন, "সরমা"র অন্যতম প্রধান চরিত্র "রাবণে"র ভূমিকা গ্রহণ ক'রে। ফলে অভিনয় হয়েছিল the play of Hamlet

without the prince of Denmark. কাজেই এ-ধরণের অভিনয়ের চুলচেরা সমালোচনায় কারুরই প্রতি সুবিচার করা হবে না জেনে আমরা সাধ্যমত কর্ত্তব্য সম্পাদনের চেষ্টা ক'রব। আর একরাত্রি অভিনয় দেখবার পরেই কলম ধরা উচিত ছিল; কিন্তু আমাদের 'পূজার সংখ্যা' সম্ভবতঃ শনিবারের ভিতরেই প্রকাশিত হচ্ছে। কাজেই আমাদের গত্যন্তর নেই।

*

অভিনয়ের দিক দিয়ে "সরমা" মোটের উপর সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। সেদিন শিশিরকুমারের অভিনয় দেখে মনে হ'ল, সুপ্রস্তুত অবস্থায় "রাবণে"র ভূমিকাভিনয় যে একটি স্মরণীয় উপভোগ্য ব্যাপার হয়ে উঠবে, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি। তাঁকে বাদ দিয়ে সেরাত্রে কিন্তু শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ীর "রাম"ই আসর সরগরম রেখেছিল। এই ভূমিকায় তাঁকে যেমন সুন্দর মানিয়েছিল, তেমনই তাঁর বাচন-মাধুর্য্য দর্শকদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে করেছিল অতিমাত্রায় পরিতৃপ্ত। "বিভীষণ"-বেশে শ্রীশৈলেন চৌধুরীর অভিনয় দেখে বুঝতে একটুও বাকী রইল না যে, তিনি ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলেছেন ধাপে ধাপে। কিন্তু শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "তরণীসেন" আমাদের রীতিমত হতাশ করেছে। এত বড়ো একটি সুকঠিন ভূমিকায় অভিনয় করবার মতো ক্ষমতা এবং আত্মবিশ্বাস মাণিকবাবুর নেই; স্থানে স্থানে তাঁর দাঁড়াবার ভঙ্গী যেমন হাস্যকর, তাঁর কণ্ঠস্বরে মাধুর্য্য এবং ক্রমোত্থানপতনের অভাব তেমনই শ্রুতিপীড়াদায়ক। শ্রীশান্তশীল গোস্বামীর "কালনেমী"কে আমাদের ভালো লেগেছে; কিন্তু রক্ষসৈন্যদলের গানের সঙ্গে তাঁর নাচের দুঃশ্চেষ্টা এবং রণস্থলে তাঁর "বাপ্‌রে বাপ্‌, লাগালে তাক"-গান—এ-দুটোই হয়েছে অসহনীয়ভাবে খারাপ। অন্যান্য পুরুষ-ভূমিকায় কেউই মন্দ অভিনয় করেন নি।

*

স্ত্রী-ভূমিকার মধ্যে শ্রীমতী কঙ্কার "মন্দোদরী" অতি-সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রতে সমর্থ হয়েছিল। তাঁর বাচন এবং গতি-ভঙ্গীতে এমন একটি সুন্দর dignity-র ছাপ পাওয়া যায়, যা আমাদের খুসী না ক'রে পারে না। "সীতা"র নাতিবৃহৎ ভূমিকায় শ্রীমতী প্রভা অসামান্য নাট্যনিপুণতা দেখিয়েছেন; তাঁর দরদী কণ্ঠের সুমধুর আবৃত্তি আমাদের আনন্দ দিয়েছে প্রচুর পরিমাণে। শিশিরকুমারের মতো উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে থাকলে শ্রীমতী রাণীবালা যে ভবিষ্যতে একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রীর সম্মান দাবী ক'রতে পারবেন, একথা আমরা "বিরাজ-বৌ"-এর সমালোচনার সময়েই বলেছিলুম। আমাদের ভবিষ্যদ্বাণী যে মিথ্যায় পরিণত হবে না, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে শ্রীমতী রাণীর "সরমা" দেখে। এই নবীনা অভিনেত্রীটী "সরমা"র সুবৃহৎ ভূমিকায় যে প্রাণঢালা অভিনয় করেছেন, তা আন্তরিক প্রশংসালাভের যোগ্য। শ্রীমতী রাধারাণীর "ত্রিজটা" চলনসৈ।

*

বন্ধুদের মুখে শুনেছিলুম, "সরমা" একখানি কাব্যপ্রধান নাটক। স্বীকার ক'রতে বাধা নেই, "সরমা"র বহুস্থানেই আবৃত্তি করবার সুযোগ আছে এবং সে-সুযোগের সদ্ব্যবহার ক'রতে শিশিরকুমার আদৌ ত্রুটী করেননি। কিন্তু নাট্যকারের ভাষায় সামঞ্জস্যের অভাব, পুনরুক্তি দোষ, উপমার অপপ্রয়োগ, ছন্দপতনের প্রাচুর্য্য এবং ভাবের দৈন্য "সরমা"কে "নর-নারায়ণে"র মত কাব্য হিসেবেও উঁচু হ'তে দেয়নি। "সরমা"র প্রথম তিনটি দৃশ্য দেখে আমরা সত্যই উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলুম; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ আশঙ্কাও জেগেছিল, এত চড়া পর্দ্দায় যার আরম্ভ, তার সমাপ্তি হয়ত' খাদে নেমে যাবে।—আমাদের আশঙ্কা অমূলক হয়নি। জানিনা, পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্জ্জনের ফলে "সরমা" পরে কি রূপ-গ্রহণ করেছে, কিন্তু উদ্বোধন-রজনীতে তার নাট্যরূপ আমাদের খুসী ক'রতে পারেনি আদপেই।

*

"সরমা"র দৃশ্যপট ও সাজসজ্জা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশংসনীয়; বিশেষ ক'রে "রাজসভা"র দৃশ্যটি উচ্চশ্রেণীর কলাকারুর পরিচায়ক।

*

২৯-এ সেপ্টেম্বর শনিবার মিনার্ভা শ্রীসুধীন্দ্র রাহা রচিত নূতন ঐতিহাসিক নাটক "মারাঠা-মোগল" খুলেছেন। রসিক-জনের মারফত এই নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে যে-সংবাদ কানে এল, তাতে মিনার্ভার দিকে পা-বাড়ানোর জন্যে আমাদের কিছুমাত্র আগ্রহ নেই।

*

নাট্যনিকেতন শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের প্রথম নাট্যপ্রচেষ্টা "চক্রব্যূহ"কে মঞ্চস্থ করবার জন্যে জোর তোড়জোড় করছেন।

*

অন্ধ-গায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে "নাচঘর" মারফত সাধারণকে একটি কথা জানিয়ে দিতে চান। প্রায়ই দেখা যায়, নানা রকম জলসা এবং প্রমোদানুষ্ঠানে (variety entertainment-এ) তাঁর নাম বিজ্ঞাপিত হ'লেও শেষ পর্য্যন্ত তিনি এসে হাজির হন না। এবং এই অবাঞ্ছনীয় ব্যাপারের জন্যে অনুষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষরা কৃষ্ণচন্দ্রের স্কন্ধেই সমস্ত দায়িত্ব নিক্ষেপ ক'রে নিজেরা মুক্তি পেতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র জানাচ্ছেন, কথা দিয়ে তা রক্ষা না করা তাঁর অভ্যাসের বাইরে। কোন অনুষ্ঠানে তাঁর অনুপস্থিতির জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী হচ্ছেন সেই আয়োজনের কর্ত্তারা। বহু সময়েই তাঁরা হয়ত তাঁর অজ্ঞাতেই তাঁর নামকে বিজ্ঞাপিত ক'রে প্রমোদ-সূচীকে ভারী ক'রে তুলতে চান। এবং অপরাপর ক্ষেত্রে কেউ কেউ হয়ত' সত্যিই তাঁর কাছে আসেন তাঁকে নিয়ে যাবার জন্যে এবং যখন তিনি বলেন, বহুরকম কর্ত্তব্যের অনুরোধে তিনি কিছুতেই যেতে পারবেন না, তখন তাঁরা শেষ কথা ব'লে যান—দয়া ক'রে চেষ্টা ক'রে দেখবেন, যদি দশ মিনিটের জন্যেও যেতে পারেন ইত্যাদি। ভদ্রতার খাতিরে কৃষ্ণচন্দ্রকে

অনেক সময় ব'লতে হয় 'আচ্ছা, বিশেষ চেষ্টা ক'রে দেখব'। কিন্তু এই কথার উপর নির্ভর ক'রেই তারা যে কোন্ যুক্তি বলে নিশ্চিতভাবে তাঁর নামকে বিজ্ঞাপিত করেন, তা কৃষ্ণচন্দ্র কোন মতেই ভেবে ঠিক ক'রে উঠতে পারেন না। কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধ, সাধারণে যেন তাঁর আসল অবস্থা বুঝে তাঁকে অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত না করেন কোনদিনই।

•

পাঠকগণ অন্য পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে দেখতে পাবেন, এই শনি ও রবিবারে ডালহাউসি ইন্‌ষ্টিটিউটে শ্রীমতী রাগিণী দেবী ও তাঁর নৃত্য-সহচর শ্রীগোপীনাথ একটী নাচের আসর বসাচ্ছেন। দক্ষিণ ভারতের "কথাকলি" নৃত্যের কথা কল্‌কাতার রসিক-সমাজ এতদিন লোকমুখে শুনেই এসেছেন, কিন্তু সে-নৃত্যকে চাক্ষুস দেখবার সুযোগ ঘটেনি তাঁদের। শ্রীমতী রাগিণী ও শ্রীগোপীনাথ এই "কথাকলি" পদ্ধতিকেই অনুসরণ ক'রে তাঁদের নৃত্যকলা প্রদর্শন করবেন। আমরা গেল বারের "নাচঘরে" এঁদের নাচের পরিচয় দিয়েছি এবং আশা করি, তা পাঠ করবার পর প্রত্যেক নৃত্যানুরাগীই এঁদের নাচকে প্রত্যক্ষ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। এই সম্পর্কে যাঁরা এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন, তাঁদের কাছে একটা প্রশ্ন আছে। ড্যালহাউসি ইনষ্টিটিউটের পর সহরের উত্তরাঞ্চলের কোন রঙ্গগৃহে এই অপরূপ নৃত্যপ্রদর্শনীর দু'একটি আসর বসানো কি একেবারেই অসম্ভব? ড্যালহাউসি-গৃহ পর্য্যন্ত এগুনো যাঁদের ভাগ্যে ঘ'টে উঠবে না, এমন সব রসিকজনের মুখ চেয়েই আমরা এই প্রশ্ন তুল্লুম।

•

আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি লিখছেন ঃ

গত শনিবার সন্ধ্যায় "মন্দির-সঙ্ঘে"র নিমন্ত্রণে আমরা তাঁদের দ্বিতীয় অবদান "পথের শেষে"র অভিনয় দেখ্‌তে গিয়েছিলুম। "পথের শেষে"র আগে স্বর্গীয় রবীন্দ্র মৈত্রের "মানময়ী গার্লস্ স্কুল" অভিনীত হয়েছিল। এই নাটিকাটির সবটা ও "পথের শেষে"র দু'টি দৃশ্য আমরা দেখেছি। দেখে খুব আনন্দ পেয়েছি। ভবিষ্যতে এঁরা অভিনয়ে আরো উন্নতি করবেন, এ ধারণা আমাদের হয়েছে। পরিশেষে এঁদের অমায়িক আলাপ-আপ্যায়নে ও কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থায় খুশী হ'য়েই বাড়ী ফিরেছি।

চিত্রপুরী ঃ

(রঞ্জন রুদ্র)

চিত্র পরিচয় ঃ Ann Vickers (রেডিও পিকচার্স)

প্রধান ভূমিকায় ঃ আইরিন ডান্ ; কন্‌র‍্যাড্ ন্যাগেল ;
ব্রুস ক্যাবট্ ; এড্‌না মে অলিভার।
কাল থেকে এল্‌ফিন্‌ষ্টোনে শুরু হবে।

•

Ann Vickers-এর লেখক হচ্ছেন সিংক্লেয়ার লুইস্, যিনি তাঁর সতেজ এবং নির্ভীক রচনাশক্তির জন্য বিশ্ববিদিত। গত বছরের আগের বছর নোবেল পুরস্কারের জয়মাল্য তাঁর কণ্ঠে দুলেছে। লুইস সাহেবের লেখার মধ্যে মানব চরিত্রের প্রতি যে গভীর জ্ঞানের পরিচয় এবং সমাজের অসঙ্গতিপূর্ণ জীবনযাত্রার প্রতি যে নির্ম্মম কটাক্ষপাত ফুটে ওঠে, সচরাচর তেমনতর সমালোচনাপূর্ণ রসসৃষ্টির পরিচয় অন্য কোন লেখায় পাওয়া যায় না।

Ann Vickers-এর মধ্যে লেখকের সেই বৈশিষ্ট্য পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান আছে।

আশা করি, রেডিও পিকচার্স চলচ্চিত্রের পরদায় এই শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-খানির মর্য্যাদা রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন।

•

এই ছবিতে বহুদিন বাদে কন্‌রেড্ ন্যাগেলকে দেখতে পাওয়া যাবে। কন্‌রেড্ ন্যাগেলের সবাক ছবি বিশেষ দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে না। একখানি ছবি দেখেছিলাম—মেট্রোর ছবি—Idle Rich. অত্যন্ত খেলো ছবি। আশা করছি, ন্যাগেল সাহেব এবার আমাদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হবেন।

•

একখানি ছবি আসছে—Affairs of Cellini। Benvenuto Cellini নামে যে শিল্পী ও adventurer-এর জীবন-কাহিনীকে নিয়ে এই ছবি তৈরী হয়েছে, ইতালীর সেই শিল্পীর জীবন সত্যিই অত্যন্ত বিচিত্র।

The Career of Benvenuto Cellini is one of the most remarkable on Record. Destined to become a musician he became a goldsmith. His quarrelsome nature brought him to prison. Cellini effected his escape in a manner that almost suggests the Miraculous ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁর জীবন-কথার মধ্যে যে সকল রোমাঞ্চকর কাহিনী আছে, ছবির পরদায় সেগুলি কী ভাবে ফুটে উঠেছে, তা দেখবার জন্যে আগ্রহান্বিত হ'য়ে আছি। এ ছবিতে নায়কের ভূমিকায় দেখা দেবেন—ফ্রেড্‌রিক মার্চ্চ। এটাও সুসংবাদ।

•

বিলাতে ডগ্‌লাস ফেয়ারব্যাঙ্কসের অনেক পরিশ্রমের এবং অনেক সাধের ছবি The Private Life of Don Juan মুক্তিলাভ করেছে। কিন্তু যা আশা করেছিলুম, তা হয় নি—সমালোচকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা-

ধ্বনি শোনা যায় নি। উপরন্তু তাঁরা নিরাশ হয়েছেন; বলছেন—"a disappointing picture; much jerkiness of continuity and odd irrelevances suggest drastic cutting!

তা সত্ত্বেও ছবিখানি দেখবার জন্যে আগ্রহান্বিত আছি।

মার্লেন ডিট্রিকের নতুন ছবির নাম—Caprice Espagnole! ভন্ ষ্টার্ণবার্গ পরিচালনা করবেন। John Dos Pasos নামে এক লেখকের ঐ নামের উপন্যাসকে অবলম্বন ক'রেই উক্ত ছবি তোলা হবে।

অপরেশচন্দ্র

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

কোহিনুর থিয়েটার

নদীয়া, কুড়ুলগাছির বিদ্যোৎসাহী জমীদার স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার রায় এম-এ, বি-এল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র হইতেছেন শরৎবাবু। প্রসন্নবাবু হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। শরৎবাবু বি-এ পাশ করিয়া শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া কনট্রাক্টারি কার্য্য করিতেন। কলিকাতার সুবৃহৎ মিউনিসিপ্যাল ভবন ইঁহারাই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মনোমোহনবাবুর পিতা বীরেশ্বরবাবুর সহিত শরৎবাবুর পিতা প্রসন্নবাবুর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। এই উভয় পরিবার বহুদিন হইতে বংশ-পরম্পরায় সৌহার্দ্দ্য-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। মনোমোহনবাবুর মিনার্ভা থিয়েটার গ্রহণ হইতেই শরৎবাবু প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে থিয়েটারে বেড়াইতে আসিতেন। 'বলিদান' অভিনয়ের পর মনোমোহনবাবু যে সময়ে থিয়েটার লইয়া পুরী ও কটকে অভিনয় করিতে যান, সে সময়ে কলিকাতার অভিনয় বন্ধ ছিল না,—সম্প্রদায় দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একভাগ উড়িষ্যায় অভিযান করেন এবং অপর ভাগ কলিকাতায় অভিনয় করিতে থাকেন। ইহাদের মধ্যে দুই চারিজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতাকে শনি ও রবিবার কলিকাতায় অভিনয় করিয়া কটকে যাইতে হইত, আবার শনিবারে কটক হইতে ফিরিয়া আসিয়া এখানকার অভিনয়ে যোগদান করিতে হইত। এই সময়ে শরৎবাবু মনোমোহনবাবুর তরফে মিনার্ভা থিয়েটারের তত্ত্বাবধান করিতেন।

'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মীর কাসীম' অভিনয়ে মিনার্ভা থিয়েটারের অসাধারণ প্রতিপত্তি এবং প্রচুর অর্থাগম দেখিয়া শরৎবাবু মনোমোহনবাবুকে বলেন, "তোমরা থিয়েটারে আমাকে অংশীদার করিয়া লও।" মনোমোহনবাবু বলেন, "আমি মহেন্দ্রবাবুকে থিয়েটারের লাভের এক-তৃতীয়াংশ দিব বলিয়াছি। যদিও তাঁহার সহিত কোনও লেখাপড়া নাই এবং তুমি আমার অন্যান্য কার্য্যের বখরাদার,—তাহা বলিয়া মহেন্দ্রবাবুকে কথা দিয়া আবার তাহা ভঙ্গ করিয়া তোমাকে অংশীদার করিতে পারিব না।" শরৎবাবু ইহাতে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। পরে ১৩১৪ সালে যে সময়ে স্বর্গীয় গোপাললাল শীলের এমারেল্ড থিয়েটার (অমরবাবু এই থিয়েটার গোপালবাবুর নিকট হইতে লিজ লইয়া ক্লাসিক থিয়েটার নাম দিয়াছিলেন) প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে বিজ্ঞাপিত হয়, সে সময়ে মনোমোহনবাবুও উক্ত থিয়েটার খরিদ করিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু শরৎবাবু একলক্ষ আট হাজার টাকা উচ্চ দর দিয়া উহা খরিদ করেন।

শরৎবাবু এই থিয়েটার ক্রয় করিয়া তাঁহাদের সাধারণ বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণী স্বর্গীয় কালীনাথ মিত্র সি-আই-ই মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ মিত্র (মনোমোহনবাবু ও শরৎবাবুর কনট্রাক্টরী কার্য্যের অন্যতম অংশীদার) মহাশয়কে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে দিয়া মনোমোহনবাবুকে বলিয়া পাঠান,—"আমরা দুইজনে দুইটা থিয়েটার খরিদ করিয়াছি। এক্ষণে এসো, আমরা যেমন কনট্রাক্টরী কার্য্যে দুই জনে বখরাদার ছিলাম, সেইরূপ থিয়েটারের কার্য্যেও দুইজনে বখরাদার হইয়া কার্য্য করি।" ইহাতে মনোমোহনবাবু পুনরায় সেই একই উত্তর দেন,—"আমি মহেন্দ্রবাবুকে এক-তৃতীয়াংশ বখরা দিব বলিয়াছি,—আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার সহিত মিলিত হইতে পারিব না।" ইহাতে শরৎবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া মনোমোহনবাবুর মিনার্ভা থিয়েটার নষ্ট করিয়া দিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করেন। যখন দেখিলেন—মনোমোহনবাবু অটল, তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে একান্ত অসম্মত, তখন শরৎবাবু তাঁহার ক্রীত থিয়েটার স্বয়ং পরিচালনা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই সময়ে অপরেশবাবু ষ্টার থিয়েটার পরিত্যাগ করিয়া শরৎবাবুর সহিত মিলিত হইলেন। কোহিনুর থিয়েটার কিরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল, এতদ্‌সম্বন্ধে অপরেশবাবু তাঁহার 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"এই 'কোহিনুর' খুলিবার আগে আমি প্রায় আট মাস কাল 'ষ্টারে' অ্যামেচার ভাবে কার্য্য করিতেছিলাম। শরৎবাবুর 'ক্লাসিকের' বাড়ী কেনা হইলে, আবার থিয়েটার করিবার জন্য কোমর বাঁধিলাম। গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর—দু'জনেই তখনও মিনার্ভায়। আষাঢ়, শ্রাবণে গিরিশবাবুর নূতন বই—'ছত্রপতি' খোলা হইবে—ইহা বাজারে কাণাঘুসা শুনা যাইতেছে। আমরা থিয়েটারের বাড়ী তো লইলাম, কিন্তু কাহাকে লইয়া থিয়েটার খুলিব?—দল কোথায়? বই কোথায়? শ্রদ্ধেয় চুনীলাল দেব—চুনীবাবু, তাঁহার ভাই নিখিলবাবু, এবং আর আর যে সব এ্যাক্টার, এ্যাক্ট্রেস বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের লইয়াই স্বতন্ত্র দল গড়া হইবে। কোন থিয়েটার হইতে কাহাকেও ভাঙ্গান হইবে না, এইরূপ সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু পরামর্শ-পর্ব্বেই চুনীবাবুর সহিত নানা বিষয় লইয়া মতের গরমিল হইল। তিনি আমাদের সঙ্গে কাজ করিতে সম্মত হইলেন না। দল ভাঙ্গাইয়া দল গড়া ভিন্ন আমাদের তখন আর উপায়ান্তর রহিল না। পরামর্শ করিবার জন্য আমরা প্রথমে গেলাম স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু মহাশয়ের নিকটে। তিনি বরাবরই দল ভাঙ্গানোর বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনিও পরামর্শ দিলেন—'নূতন লোক লইয়া শিখাইয়া দল তৈয়ারী কর'। আমরা বলিলাম—কোন আপত্তি নাই, যদি তিনি আমাদের আচার্য্য হইয়া নূতন দল তৈয়ারীর ভার গ্রহণ করেন। দুই চারি দিন পরামর্শের পর অমৃতবাবু বলিলেন, তিনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন, যদি তাঁহাকে ছয় মাসের সময় দেওয়া হয়। যদিও তিনি তখন ষ্টারের অন্যতম সত্ত্বাধিকারী, কিন্তু ষ্টারের আর্থিক অবস্থা একেবারেই ভাল ছিল না। ক্ষীরোদবাবুর 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' ও 'নন্দকুমার' আর্থিক হিসাবে বিশেষ সুবিধাজনক হয় নাই। তখন কেবল একা মিনার্ভাই জোর চলিতেছিল। অমরেন্দ্রনাথও তখন গ্র্যাণ্ড থিয়েটার লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমরা অমৃতবাবুর কথায় সম্মত হইতে পারিলাম না। কারণ, ছয় মাস অপেক্ষা করিবার মত অবস্থা আমাদের ছিল না। আমাদের ঘাড়ে তখন থিয়েটারের ভূত চাপিয়াছে। শরৎবাবু অমৃতবাবুকে বলিলেন,—আমরা ছয় মাস অপেক্ষা করিতে পারিব না, যদি এক মাসের নোটিশ দিয়া আসিতে সম্মত হন, আমরা ছয় হাজার টাকা বোনাস ও আপনার মর্য্যাদা অনুরূপ এ্যালাওয়েন্স দিতে প্রস্তুত আছি। অমৃতবাবু বলিলেন—দেখুন, এতগুলো টাকা একসঙ্গে পেলে আমার খুব উপকার হয় বটে, কিন্তু আমি হঠাৎ কি ক'রে ছেড়ে যাই? আপনারা যদি অপেক্ষা ক'রতে না পারেন তো অন্য চেষ্টা দেখুন।—আমরা অন্য চেষ্টা দেখিলাম।"

শরৎবাবুর পিতা প্রসন্নবাবু বহুদর্শী ও বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি শরৎবাবুর নিকট গিরিশচন্দ্রের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন,—যদি আদর্শ নাট্যশালা স্থাপন করিতে চাও, তাহা হইলে তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে কার্য্যভার অর্পণ কর।"

[ক্রমশঃ]

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

THE JUNGLE UNFOLDS ITS WORLD OF MYSTERY
TO THE MAN WHO IS ITS LORD!
You'll see him capture a thundering herd of elephants!
You'll see him fight a hooded cobra ... bare handed and unarmed!
You'll see the breathless battle between a man and 18 feet of python fury!
You'll see him rope a rare white armored rhino!
Bring-'Em-Back-Alive
FRANK BUCK'S
"WILD CARGO"
A living record of the strangest trade a man has ever worked at!
Why is it... NATURE SAVES HER BIGGEST THRILLS FOR BUCK!
LOOK OUT
FOR IT
AT THE
MADAN THEATRE

নাচঘর

১০ম বর্ষ, ৩৭শ সংখ্যা } { ২৫শে আশ্বিন, ১৩৪১

মা আস্‌চেন—

বাহির থেকে তাগিদ আস্‌চে, আগমনী গাইতে হবে—মা আস্‌চেন!

*

কিন্তু অন্তরের সাড়া পাচ্ছি কৈ? মনে প্রশ্ন উঠছে, কার মা আস্‌চেন? এই দুর্ব্বল বাঙালীর?—না, মিথ্যা কথা। শক্তিহীনের মা নেই। বীরের ভক্তিতে যার আসন টলে, দুর্ব্বলের আকুতিতে নয়। বরদাত্রীর অভয়হস্ত প্রসারিত হয় শক্তিমান সন্তানকে বিপদ হ'তে মুক্ত করবার জন্যে, ক্লীবের মাতৃত্বকে তিনি অস্বীকার করেন। সিংহ-বাহিনী রণরঙ্গিনী দশ-প্রহরণধারিনী যে মা, সে মা কি ভীরু কাপুরুষ মোহাচ্ছন্ন ক্রন্দন-সহায় সন্তানের মা হ'তে পারেন?—

*

বছরের পর বছর শরৎকাল আসে, বাঙালী দুর্গোৎসবের ক্ষণিক আনন্দে মেতে ওঠে, নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের দুঃখকে দূরে ঠেলে রেখে। নতুন জামা-কাপড় পরে, পরায়। যার বাড়ীতে পূজো, সে পাঁচজনকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়ায়। যার বাড়ী পূজো নেই, সে হাত ধরাধরি ক'রে পাঁচ বাড়ী পূজো দেখে বেড়ায়, সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজার মাঠে ভীড় ঠেলে সঙ্‌ দেখে আসে—সে সঙে 'দুর্ব্বাসার পারণ' আছে, 'অভিমন্যু বধ' আছে, 'বাঙালী বিধবার একাদশী' আছে, 'গোল-টেবিল বৈঠক' আছে, 'ইংরেজের জেলখানা' আছে, আবার লাল শালুর ওপর লেখা—'Freedom is my birthright'-ও আছে। বাঙালী সঙ্‌ই দেখে, তার বেশী কিছু নয়।

*

আবার ব্যারিষ্টার, অ্যাড্‌ভোকেট, বড় চাকুরেদের আনন্দ অন্য দিকে। পূজোর ছুটি সুরু হবার আগে থাকতেই জল্পনা কল্পনা, টাইমটেব্‌ল্‌ দেখা ইত্যাদি চলতে থাকে। যেই ছুটি সুরু, অমনি বেডিং, সুটকেশ প্রভৃতি নিয়ে ইলা, লিলি, রমি, অনিমা-বৌ এবং বাহাদুরকে সঙ্গে ক'রে ট্যাক্সিযোগে হাওড়া ষ্টেশন এবং পরদিন প্রাতেই মধুপুর, গিরিডি, ঝাঁঝা, দেওঘর বা ঐ ধরণের কোন একটা জায়গায় গিয়ে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলা। বাঙলার বাহির থেকে অ-বাঙালী বাঙলায় আসে বাঙালীর পূজোর আনন্দে যোগদান ক'রতে; আর বাঙলার দুলালরা বাঙলা ছেড়ে বিহার বা ইউ-পিতে যান পূজোর ছুটি উপভোগ ক'রতে—তাঁদের কাছে পূজোটা উপলক্ষ্য মাত্র, পূজোর ছুটিটাই হচ্ছে বড়ো জিনিষ।

*

শ্রীমতী বীণা
রাধা ফিল্মের বাংলা বাণী-চিত্র
"রাজ-নটী বসন্তসেনা"র নাম-ভূমিকায়

দুর্গাপূজা আসে, বাঙালী আনন্দ করে। জামা কাপড় জুতোর দোকানে ভীড়; কলেজ-ষ্ট্রীট মার্কেটের সামনে দিয়ে হাঁটবার উপায় নেই। অছেল্‌মোল্লার দোকানের পথে মোটরে মোটরে ছয়লাপ; ধারিকের লোকেরা খাবার বেচে শেষ ক'রে উঠতে পারেনা। আমরা—কাগজওয়ালারা সোৎসাহে 'পূজা স্পেশাল' বার করি, হকারেরা চেঁচিয়ে বেচে। রাস্তার ধারের দেওয়াল হরেক রকম বিজ্ঞাপনে ছেয়ে যায়, বায়োস্কোপ-বাড়ীতে বাদুড় ঝোলে।

*

পূজোর আনন্দ! আমরা থাল ভ'রে আইস্‌-ক্রীম, হিমসাগর সন্দেশ খাই, ওদিকে দুধের অভাবে শিশুমৃত্যুর হার বেড়েই চলে; আমরা সহরে ব'সে প্রেমময়ী নারীর কণ্ঠে হীরের নেক্‌লেস দোলাই, মর্ত্তের অমৃত Johnnie Walker still going strong করি, আর নির্ব্বিকার চিত্তে খবরের কাগজে নারীহরণের সংবাদ পড়ি; মাস গেলে আমাদের smoking expense হচ্ছে থোক আড়াইশো টাকা, আর সে টাকা সংগ্রহ হয় চাষীভূষী রেয়ত-প্রজার রক্তমোক্ষণ ক'রে; আমাদের মেয়ে ইস্কুলে যায় রোজ রোজ শাড়ী-জুতো-কানের ইয়ারিং পাল্টে, আর গ্রামের সদাশিব মোড়লের ছেলে ষষ্ঠীদাস প্রবেশিকায় পনেরো টাকা

জলপানি পেয়েও কলেজে ভর্ত্তি হ'তে পায় না, পড়ার খরচ যোগাতে পারবে না ব'লে এবং শেষে চাকরীর উমেদারী ক'রে হায়রাণ হয়ে আত্মহত্যা ক'রে পরিত্রাণ পায়—সরকারী খাতায় লেখা হয়, দেশে শতকরা ন'জনের বেশী শিক্ষিত নেই; গ্রামের মনোহর তাঁতী ঘটি-বাটি-থালা বাঁধা রেখেও অন্নসংস্থান করতে না পেরে শেষটা নিজের জীবনেরও অধিক, সাত পুরুষের তাঁতখানি পরের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়, আর বাঙলার বুকে ঝল্‌মল্‌বাম ছ্যধোরিয়া কাপড়ের কল বসায়, বিলিতী ভয়েল-আলপাকা-ক্রেপ বেচে বড়লোক হয়; আমরা সহরের পাঁচজন সিমলে দার্জ্জিলিং চুণার গিয়ে বায়ু-পরিবর্ত্তন ক'রে আসি, শরীরের ফ্যাট্ কমাবার জন্যে সাহেব ডাক্তারের অ্যাড্‌ভাইস্ আনাই, ব্লাড-প্রেসারে মারা যাই, আর পাড়াগাঁয়ের পাঁচশো'জন ম্যালেরিয়ায় হাড় ভাজাভাজা হয়ে, পিলে-লিভারের ওপর পান্তা ভাত আর তেঁতুলের টক খেয়েও প্রাণপাখীকে দেহ-খাঁচার ভিতর ধ'রে রাখতে পারে না, রক্তশূন্যতার দরুণ।—এই হচ্ছে বাঙলাদেশ! এই বাঙলায় মা আসেন আনন্দ-বিতরণ ক'রতে! আমরা হাসি, গাই, ফুর্ত্তি করি। আনন্দময়ীর আগমনে আকাশে-বাতাসে নাকি বাঁশী বেজে ওঠে! কবি গান করেন—"আকাশ-বীণার তারে তারে জাগে তোমার আগমনী"।——

আমরা কাঁদি—আমরা পাপী, নাস্তিক, মায়ের বিদ্রোহী সন্তান—আমরা কাঁদি। সানাইয়ের সুরে আমাদের মন গলে না, মৃত মনের শুষ্ক কোণ থেকে ভক্তিকে জোর ক'রে টেনে এনে গদ্‌গদ্‌চিত্তে চেঁচিয়ে উঠতে পারি না—"মা" ব'লে, মাতৃপূজার নামে পুতুল নিয়ে ছেলেখেলা করবার আনন্দ-রঙ্গে মেতে ওঠবার উৎসাহ আমাদের নেই, অন্তরে আমাদের সাড়া জাগে না, গাইতে পারি না আগমনী। মন বলে—মাতৃপূজা নেই, দুর্ব্বল মোহাচ্ছন্ন স্বাদেশিকতাহীন ক্লীব বাঙালীর মাতৃপূজায় অধিকার নেই।

*

"নাচঘরে"র পূজার সংখ্যাকে সাজাবার জন্যে আমরা বহু গুণী ও জ্ঞানীর রচনা পেয়েছি; কিন্তু স্থানাভাবে সকলের লেখা ছেপে উঠতে পারলুম না। যাঁদের রচনা এই সংখ্যায় বার ক'রতে পারলুম না, তাঁদের কাছে আমরা ক্ষমা ভিক্ষা করছি।

*

বরাবরের মত এবারেও "নাচঘর" পূজোর ছুটিতে চার হপ্তা বন্ধ থাকবে। "নাচঘরে"র পরবর্ত্তী সংখ্যা বেরুবে আস্‌চে—১৬ই নভেম্বর

*

গান

(স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়)

ঝড় উঠছে আকাশ-পারে—
মোদের খেলা হয় বুঝি শেষ
হয় বুঝি শেষ এইবারে!

চাঁদের আলো ফুরিয়ে আসে
রাতের আঁধার গগন গ্রাসে
কারে কোথায় হারিয়ে নে যায়
কোন্ দিকে সে কোন্ কিনারে—
ঝড় উঠেছে আকাশ-পারে!

কোথায় তোমার বাহুর বাঁধন
ঝঞ্ঝা সাথে করবে কি রণ?
শেল হানে ঐ তীক্ষ্ণধারে—
ঝড় উঠেছে আকাশ-পারে!

এই ঝড়ই কি হবে জয়ী?
মন যে বলে—নহি নহি!
ঝড়ের চেয়েও শক্ত মোদের
আগল আছে হৃদয়-দ্বারে।—
ঝড় উঠুক্ সে আকাশ-পারে!

খেলা যদি ভেঙে সে দেয়,
সকল আশা কেড়ে সে নেয়,
মোদের বাঁধন রইবে তবু
নিরাশারই ছিন্নহারে—
ঝড় উঠুক্ সে আকাশ-পারে!

মালা

(হেমেন্দ্রকুমার রায়)

(১)

দুপুর-বেলায় কপোত শোনায় ঘুমপাড়ানি গান,
রাখাল-বাঁশী সাধ্‌চে কোথায় কাজ-হারানো তান!
তমাল-ছায়া পেয়ে মাথায়
ঢুল্ এল মোর আঁখির পাতায়,
ফুল-ছড়ানো ঘাস বিছানায় এলিয়ে পড়ে প্রাণ।

(২)

ছুটল সে ঘুম—যখন মেঘে চাঁদের পিদিম জ্বালা'!
মাঠের পথে জোছ্‌না-ঝারির দুধের ধারা ঢালা।
চম্‌কে উঠে তাকিয়ে দেখি,
বক্ষে আমার দুল্‌চে একি!
চৈত্র-হাওয়ার ছন্দে ফোটা গন্ধ-ফুলের মালা!

(৩)

আমার গলায় পরিয়ে গেল কে এই মালাখানি!
লুকিয়ে যদি জাগিয়ে যেত, কী ছিল তায় হানি?
কোন্ অধরের ফুলেল পরশ
এই মালাটি করলে সরস?
রঙের লেখায় আঁকা এ কার ভীরু প্রাণের বাণী?

(৪)

নিব্‌ল অনেক চাঁদের চিতা,—অনেক রাতই ভোর,
হায় রে তবু দেয়না দেখা মালার দেবী মোর!
একে একে ফুল শুকালো,
ধরার ধূলোয় রং লুকালো,
এখন আমার গলায় দোলে কুসুম-হারা ডোর!

নাটক লিখিনা কেন ?

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণীয় পশুপতি,

তোমার প্রশ্ন—আমি নাটক লিখিনা কেন ? বোধ করি, তোমার এ জিজ্ঞাসা মনে এসেছে দুটো কারণে। প্রথম, নাট্যকার এবং অন্যান্য গ্রন্থকারের রচিত উপন্যাসের নাট্যরূপদাতা শ্রীযুক্ত যোগেশ চৌধুরী সম্প্রতি 'বাতায়নে' বাংলা নাটক সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, তাকে তুমি সম্পূর্ণ স্বীকার ক'রে নিতে পারোনি এবং দ্বিতীয় হচ্ছে, তোমরা নিরন্তর যে সমস্ত নাটকের অভিনয় দেখে থাকো, তাদের ভাব ভাষা, চরিত্রগঠন ইত্যাদি বিচার ক'রে দেখবার পর তোমাদের মনে এই কথা জেগেছে যে, শরৎচন্দ্র নাটক লিখলে হয়ত' রঙ্গমঞ্চের চেহারার একটু পরিবর্ত্তন হ'তে পারে।

তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমার প্রথম কথা এই যে, আমি নাটক লিখিনা, তার কারণ হচ্ছে আমার অক্ষমতা। দ্বিতীয়, এই অক্ষমতাকে অস্বীকার ক'রে যদিই বা নাটক লিখি, তাহ'লেও আমার মজুরী পোষাবে না। মনে কোরোনা কথাটা টাকার দিক থেকেই শুধু বলচি। সংসারে ওটার প্রয়োজন, কিন্তু একমাত্র প্রয়োজন নয় এ সত্য একদিনও ভুলিনে। উপন্যাস লিখলে মাসিকপত্রের সম্পাদক সাগ্রহে তা নিয়ে যাবেন, উপন্যাস ছাপাবার জন্যে পাব্লিশারের অভাব হবে না, অন্ততঃ হয়নি এতদিন এবং সেই উপন্যাস পড়বার লোকও পেয়ে এসেছি। গল্প লেখার ধারাটা আমি জানি। অন্ততঃ, শিখিয়ে দিন ব'লে কারও দারস্থ হবার দুর্গতি আমার আজও ঘটেনি। কিন্তু নাটক ? রঙ্গমঞ্চের কর্ত্তৃপক্ষই হচ্ছেন এর চরম হাইকোর্ট। মাথা নেড়ে যদি বলেন এ যায়গাটায় আক্শন [action] কম,—দর্শকে নেবেনা, কিম্বা এ বই অচল, ত তাকে সচল করার কোন উপায় নেই। তাঁদের রায়ই এ সম্বন্ধে শেষ কথা। কারণ তাঁরা বিশেষজ্ঞ। টাকা-দেনে-ওয়ালা দর্শকের নাড়ী-নক্ষত্র তাঁদের জানা। সুতরাং এ-বিপদের মধ্যে খামোকা ঢুকে পড়তে মন আমার দ্বিধা বোধ করে।

নাটক হয়ত' আমি লিখতে পারি। কারণ নাটকের যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু,—যা ভালো না হ'লে নাটকের প্রতিপাদ্য কিছুতেই দর্শকের অন্তরে গিয়ে পৌঁছয়না—সেই ডায়ালোগ লেখার অভ্যাস আমার আছে। কথাকে কেমন ভাবে বলতে হয়, কত সোজা ক'রে বললে তা মনের ওপর গভীর হয়ে বসে, সে কৌশল জানিনে, তা নয়। এ ছাড়া চরিত্র বা ঘটনা সৃষ্টির কথা যদি বল, তাও পারি ব'লেই বিশ্বাস করি। নাটকে ঘটনা বা সিচুয়েশান সৃষ্টি ক'রতে হয় চরিত্র-সৃষ্টির জন্যেই। চরিত্র-সৃষ্টি দু'রকমের হ'তে পারে:—এক হচ্ছে, প্রকাশ অর্থাৎ পাত্র-পাত্রী যা তাই ঘটনা-পরম্পরার সাহায্যে দর্শকের চোখের সুমুখে প্রকাশিত করা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে—চরিত্রের বিকাশ অর্থাৎ ঘটনাপরম্পরার মধ্যে দিয়ে তার জীবনের পরিবর্ত্তন দেখানো। সে ভালোর দিকেও হতে পারে, মন্দর দিকেও যেতে পারে। ধরো, একজন হয়ত' বিশ বচ্ছর আগে উইল্‌সনের হোটেলে খেত, মিথ্যা কথা বলত এবং আরও অন্যান্য অকাজ করত। আজ সে ধার্ম্মিক বৈষ্ণব—বঙ্কিমচন্দ্রের কথায়—পাতে মাছের ঝোল পড়লে হাত দিয়ে মুছে ফেলে দেয়। তবু এ হয়ত' তাঁর ভণ্ডামি নয়, সত্যিকারের আন্তরিক পরিবর্ত্তন। হয়ত' অনেকগুলো ঘটনার আবর্ত্তে প'ড়ে, পাঁচটা ভালো লোকের সংস্পর্শে এসে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আজ সে সত্যি ক'রে বদলে গেছে। সুতরাং বিশ বচ্ছর আগে সে যা ছিল, তাও সত্যি এবং আজ সে যা হয়েছে, তাও সত্যি। কিন্তু যা-তা হ'লে ত হবে না,—বইয়ের মধ্যে দিয়ে লেখার মধ্যে দিয়ে পাঠক বা দর্শকের কাছে তাকে সত্যি ক'রে তুলতে হবে। এমন যেননা তাঁদের মনে হয়, লেখার মধ্যে এ পরিবর্ত্তনের হেতু খুঁজে মেলেনা। কাজটা শক্ত। আর একটা কথা—উপন্যাসের মত নাটকের elasticity নেই; নাটককে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের বেশী এগুতে দেওয়া চলে না। ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে নাটককে দৃশ্যে বা অঙ্কে ভাগ করা,—তাও হয়ত' চেষ্টা করলে দুঃসাধ্য হবে না। কিন্তু ভাবি, ক'রে কি হবে ? নাটক যে লিখব, তা অভিনয় করবে কে ? শিক্ষিত বোঝদার অভিনেতা অভিনেত্রী কৈ ? নাটকের হিরোইন সাজবে, এমন একটীও অভিনেত্রী ত' নজরে পড়ে না। এমনি ধারা নানা কারণে সাহিত্যের এই দিকটায় পা বাড়াতে ইচ্ছে করে না। আশা করি একদিন বর্ত্তমান রঙ্গালয়ের এই অভাবটা ঘুচবে, কিন্তু আমরা তা হয়ত' চোখে দেখে যেতে পারবো না। অবশ্য সত্যিকারের তাগিদ যদি আসে, কখনো হয়ত' লিখতেও পারি। কিন্তু আশা বড় করিনে।

ভারতীয় নৃত্য

[উদয়শঙ্কর]

অনেকেই ব'লে থাকেন, উদয়শঙ্করের নাচ ভারতীয় নয়। দু'দশজন আমার মুখের ওপরেই ব'লে গেছেন যে, আমার নাচের ভিতর বিলিতী জিনিষ মেশানো আছে। খাঁটী ভারতীয় নৃত্যের কথা ব'লতে গিয়ে তাঁরা নজীর খুলে বসেন,—ভরত-নাট্যশাস্ত্র, বেদ, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ। একটা শ্লোক মুখস্থ আউড়ে গিয়ে একজন বললেন, এর মধ্যে যে বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে, আপনার শিব-নৃত্যে তা নেই। এবং এই ধরণের আরও অনেক কথা।

এঁদের অভিযোগের উত্তরে প্রথমেই আমি বলি, আমার নাচে বিলিতী গন্ধ আছে, এমন অদ্ভুত ধারণা তাঁদের হ'ল কোথা থেকে? আজ টাকার অভাবে দেশবিদেশে হাহাকার ছুটে যাচ্ছে। জার্ম্মানী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি জায়গায় কতো নামজাদা ভালো ভালো নাচিয়ে যে আজ না খেতে পেয়ে মরতে বসেছে, তার হিসেব নেই। অথচ সেই সব দেশ থেকেই আমি আমার নাচ দেখিয়ে এমন দুর্দ্দিনেও কতো না টাকা রোজগার করেছি! আমেরিকার চোখে ভারত-বাসীকে ছোট করবার জন্যে মিস্ মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি কতো ব্যবস্থাই না আছে? কিন্তু সেই আমেরিকা আমার নাচ দেখে অর্থ এবং সম্মান দুইই দিয়েছে প্রচুর পরিমাণে। ঐ সব দেশে ভেল চলে না, তারা আসল মেকী চিনতে পারে। প্রাচীন ভারতকে আমরা যত না জানি, তারা তার থেকে ঢের বেশী জানে। আমাদের সমস্ত ভালো ভালো সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত গ্রন্থের অনুবাদ তাদের দেশে আছে। আমার নাচে বিলিতীর ছায়া থাকলে তারা তা ধ'রে ফেলত চট ক'রে এবং আমাকে নাচতেই দিত না। তাদের নাচ থেকে চুরি-করা-নাচ তাদেরই দেখিয়ে টাকা রোজগারের সুযোগ একজন ভারত-বাসীর পক্ষে কোথায়? আমার পা নাকি বিলিতী! আপনারা বললে হয়ত' বিশ্বাস করবেন না, অন্য নাচ শেখা ত' দূরের কথা, আমি জীবনে কোনদিন ওদের বল্-নাচেও যোগ দিই নি।

উদয়শঙ্কর

এর পর ভরত-নাট্যশাস্ত্র প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের কথা। হাজার দু'-হাজার বছর আগে ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশে কি নাচ প্রচলিত ছিল, তা' বই প'ড়ে বা অজন্তা-ইলোরার ছবি দেখে অনুমান করা খুবই শক্ত। পুরোণো বই থেকে নাচের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা থেকে কোন একটি নাচ সম্বন্ধে পুরোপুরি ধারণা হওয়া একেবারেই অসম্ভব। প্রাচীন ভারতের নাচ আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছিনা, তার কিছু কিছু বিবরণ প'ড়তে পাই মাত্র। যেমন সংস্কৃত গ্রন্থাদি প'ড়ে সে যুগের ভারতের আচার ব্যবহার সভ্যতা সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে মাত্র একটা আবছায়া ধারণা জন্মায়, তেমনই নাচের সম্বন্ধেও সমান কথাই বলা যায়। তার ওপর ধরুন, ঐ যে ভদ্রলোকটি 'শিব-নৃত্য' সম্পর্কে একটি শ্লোক বললেন, আমায় যদি সেই শ্লোকের প্রত্যেকটি কথাকে অনুসরণ ক'রে নাচতে হয়, তা' হ'লে প্রথমেই আমাকে হ'তে হবে দিগম্বর। কিন্তু দিগম্বর হয়ে আমি শিব-নৃত্য দেখাই কি ক'রে? এবং আমি দেখাতে চাইলেও লোকে তা দেখবে কেন? সভ্য জগৎ এবং পুলিশ আমার দিগম্বর বেশকে বরদাস্ত করবেনা নিশ্চয়ই।

এবং এর উপরেও কথা আছে। মনে করুন, কোন রকম আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপ গোছের জিনিষের সাহায্যে আমি প্রাচীন ভারতে প্রচলিত নৃত্য সম্বন্ধে সমস্তই অবগত হলুম। কিন্তু তাই ব'লে সেই নৃত্যকেই যে আজকের দিনে রূপ দিতে হবে, এমন দাবী ওঠে কেন? যে কারণে সেই যুগের আচার ব্যবহার আজকের যুগে প্রচলিত নেই, যে কারণে আমরা আজও ছান্দস্ বা প্রাকৃত ভাষায় কথা কই না, যে কারণে আজকের দিনে আমাদের মধ্যে দেবভাষায় বই লেখার রেওয়াজ নেই, ঠিক সেই কারণেই সে-যুগের নাচও আজকের যুগে অচল। সে যুগের নাচ হুবহু নাচতে পারলেই ভারতীয় নৃত্য দেখানো হবে, নইলে নয়—এমন কথা বলা যায় কোন্ যুক্তির জোরে? বর্ত্তমান যুগকে অনুসরণ ক'রে, বর্ত্তমান সভ্যতা, সংস্কৃতি ও রুচির দিকে লক্ষ্য রেখে আমি যদি আমার নাচের ভিতর দিয়ে ভারতীয় বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলতে পারি, তা' হ'লে তাই হবে আমার মতে, ভারতীয় নাচ।

অনেকে বলেন, কাল্কাবৃন্দের শিষ্য-প্রশিষ্যবর্গ যে নৃত্য-পদ্ধতি অনুসরণ করেন, তাই হচ্ছে খাঁটী ভারতীয় নৃত্য। আমি কাল্কাবৃন্দকে দেখিনি। তিনি যে নিশ্চয়ই একজন বড় নর্ত্তক ছিলেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই; নইলে তাঁর নাম আজ ভারতের বহু স্থানে এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে কেন? কিন্তু তাঁর প্রবর্ত্তিত নৃত্য-পদ্ধতি যে আজও মেনে চলা হচ্ছে, এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না। কাল্কাবৃন্দকে যাঁরা গুরু ব'লে জাহির

এতদিনে প্রতীক্ষার অবসান!
রাধা ফিল্মের অপূর্ব্ব সুষমামণ্ডিত পৌরাণিক বাংলা বাণী-চিত্র
দক্ষযজ্ঞ
দক্ষযজ্ঞ
* সংগঠনকারী *
পরিচালনা ও চিত্রনাট্য : জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়
কথা ও কাহিনী : হেমেন্দ্রকুমার রায় ও কৃষ্ণধন দে, এম্-এ
আলোক-চিত্র : ডি, জি, গুণে
শব্দ-নিয়ন্ত্রণ : ডাঃ হৃষীকেশ রক্ষিত, ডি-এস্-সি
সঙ্গীতাংশ : হেমেন্দ্রকুমার রায়
সুর-সংযোজনা : হিমাংশু দত্ত ও হরিপদ রায়
নৃত্য-পরিকল্পনা : তারকনাথ বাগচী ও কুমার মিত্র
নেপথ্য-সঙ্গীত : অনাথ বসু
দৃশ্য-সজ্জা : শঙ্কর ঘুরাজী ও রামচন্দ্র পাওয়ার
রূপ-সজ্জা : মণীন্দ্র মিত্র
প্রযোজনা
রাধা ফিল্ম্ কোম্পানী
শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করিয়াছেন : অহীন্দ্র চৌধুরী ও চন্দ্রাবতী তৎসহ ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, রবি রায়, মৃণাল ঘোষ, বীণাপাণি এবং শ্রীমতী রাধারাণী

করেন, তাঁদের মধ্যে দু'একজনের নাচ আমি দেখিছি। কিন্তু তার ভিতর নাচ কৈ? সে ত' কেবল পায়ের কসরৎ! একটা চৌতালের মধ্যে বারো বার পা ফেলে কোনক্রমে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে গোড়ার ধাপে ফিরে যাওয়াকে যদি নাচ বলা হয়, তা' হ'লে আমি নাচার। কোথায় বা নাচের লীলায়িত গতি, কোথায় বা grace, আর কোথায় বা সৌন্দর্য্যসৃষ্টি! অবশ্য নানা ধরণের সূক্ষ্ম বা দ্রুত পদবিক্ষেপকেও আমি খুবই প্রশংসা করি; তবু সঙ্গে সঙ্গে এও বলতে চাই যে, খালি ঐ পা-ফেলাটাই নাচের সবখানি নয়, মাত্র অঙ্গ-বিশেষ হ'তে পারে। পায়ের ঘুঙুরের ভিতর দিয়ে বোল্ বাহির করা কিংবা ভাও বাতলানোই যে নাচ, একথা লোকে বলে কি ক'রে, তা আমি ভেবে পাইনা। নাচের সময় চরণ-ক্ষেপ হচ্ছে দেহের গতির সঙ্গে তাল রাখা মাত্র, তার বেশী নয়। আমি পণ্ডিত নই; সংস্কৃততে আমার বিদ্যা নেই; কিন্তু ভরত-নাট্যশাস্ত্রের ইংরাজী অনুবাদ আমি পড়েছি। তার ভিতর কোথাও ত' দেখি না যে, পা ফেলাই হচ্ছে নাচের যা-কিছু। এ ছাড়া কাল্‌কাবৃন্দ ত' সবে আশী বছরের কথা এবং ভারতের একটি মাত্র প্রদেশের মধ্যেই এঁর নৃত্য-পদ্ধতি বিশেষ ভাবে প্রচলিত। কাজেই এই নৃত্য-পদ্ধতিকেই একমাত্র আদি ও অকৃত্রিম ভারতীয় নৃত্য ব'লে দাবী করা নিশ্চয়ই সঙ্গত নয়।

কাল্‌কাবৃন্দের school-এর সমর্থনকারী এক ভদ্রলোকের প্রবন্ধে পড়ছিলুম, শ্রীকৃষ্ণ চোগা-চাপকান প'রে নাচবেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গত থাকবে তবলা ও বাঁয়া। কিন্তু চোগা-চাপকান এবং তবলা-বাঁয়া—দুইই হচ্ছে মুসলমানদের আমদানী। তবলা-বাঁয়া তো আমার মনে হয়, আমাদের মৃদঙ্গকে দু'ভাগ ক'রে তৈরী—হিন্দুদের যন্ত্রটার উপর বিদ্বেষ ক'রে তারই অনুসরণে হয়েছে ওদের জন্ম। সে যা হোক, একবার কল্পনা ক'রে দেখুন ত', চোগা-চাপকান-পরা শ্রীকৃষ্ণ তবলা-বাঁয়ার সঙ্গে নাচবেন!—The very idea is ridiculous and at the same time revolting নয় কি?

সেদিন মণিপুরের নাচ দেখতে গিয়েছিলুম। ছোট ছোট মেয়ে সেজে-গুজে 'রাধাকৃষ্ণ' নাচ নাচলে; যে রাধা সেজেছিল, সে নাচতে নাচতে ভাবে বিভোর হয়ে সত্যি সত্যি কেঁদে ফেললে।—তাদের সারাটা দেহ, সমস্ত আত্মা সেই নাচের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল; তাই তাদের নাচ করেছিল সত্যিকারের রসসৃষ্টি এবং সেই কারণে তা আমার অন্তরকেও স্পর্শ করতে পেরেছিল। সাঁওতালদের নাচ দেখেছি—তারা ফসল কাটার নাচ নাচে, বীজ বপনের নাচ নাচে, তাদের নাচ হচ্ছে Nature Dance. কী সুন্দর তাদের দেহ, কী স্বচ্ছন্দ তাদের গতি, তাদের নাচ মনকে মাতিয়ে তোলে। মালাবারের 'কথাকলি' নাচেও সত্যি ভারতীয় নাচ দেখতে পাই; সেখানে নাচিয়েরা আবার জীবজন্তুর অনুকরণ করে, নাচের ভিতর দিয়ে গল্প বলে। ভারতীয় নাচ যদি শিখতে হয়, তা'হ'লে তা এই মণিপুর-বালিকাদের কাছে, সাঁওতালদের কাছে, মালাবারের নাচিয়েদের কাছে।

মাদ্রাজের অন্তর্গত বহু জায়গায়, বিশেষ ক'রে তাঞ্জোরে এই ভারতীয় নৃত্য আজও বেঁচে আছে। আমাদের বাঙলাদেশেও শুনেছি এমন অনেক রকম নাচ আছে, যা এখনও পর্য্যন্ত আমার দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। আমি সেইদিনের প্রতীক্ষা করছি, যেদিন এই সব নাচের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটবে, ভারতীয় নৃত্যভাণ্ডারের সমস্ত সম্পদ আমার চোখের সামনে ধরা দেবে। এই সব নাচের বিবরণ শুনে আমার মনে হয়, ভারতীয় নৃত্যে আমার দেখবার এবং শেখবার জিনিষ এখনও অনেক আছে, বিশেষ বাঙলাদেশের Folk Dance থেকে। এবং এই শিক্ষার জন্যে আমি তাদেরই গুরু হিসেবে বরণ করিতে রাজী আছি, যারা শিক্ষা ও সংস্কৃতির গুরুতর অভাব সত্ত্বেও যথার্থ ভারতীয় নাচকে আজও অবধি জীবন্ত ক'রে রাখতে পেরেছে। তা নয়, বাতাসা-নৃত্য, আবীর-নৃত্য, বিশটা ঘুঙুরের ভিতর একটি বাজল, বাকী বাজল না—এই নৃত্য—এত' হচ্ছে মাত্র jugglery, এদের নাচ ব'লব কি ক'রে?

নাচ ব'লতে আমি বুঝি, আমার জীবনের নৃত্য, অভিব্যক্তি। আমি যখন নাচব, তখন আমার দেহ মন প্রাণ সমস্ত একসাথে নাচতে থাকবে; আমার হাত-পা-নাক-মুখ-চোখ সবাই তখন নেচে উঠবে, যার যেমন কাজ করবার, সে তেমনি করবে। তখন আমার শরীরে এমন কিছু movement দেখা যাবে না, যাকে মনে হবে forced. তখন আমি যা কিছু করব, সমস্তই হবে যেন impulse-এ, সব যেন আপনাআপনি সহজভাবে হয়ে যাচ্ছে ভিতরের প্রেরণা থেকে। তন্ময়তা না আনতে পারলে নাচ হয় না। আমার মতে নাচ হচ্ছে Dance of Life. এবং তাই আমি বিশ্বাস করি, যার ভিতর প্রাণের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়, তাকেই উপলক্ষ্য ক'রে নাচ হ'তে পারে। যে-কোন দেবতা, যে-কোন গাছপালা, যে-কোন জীবন্ত জিনিষকেই নাচানো যেতে পারে। অমুক দেবতা নাচবেন এবং অমুক দেবতা নাচবেন না—এ হচ্ছে শাস্ত্রকারের, পণ্ডিতের চেঁদো কথা, আর্টিষ্টের নয়। আমি নাচিয়ে, আমি নাচের ভিতর দিয়েই প্রাণকে খুঁজে পাই; কাজেই যেখানেই আমি প্রাণের সন্ধান পাব, সেখানেই তা' আমি নাচের ভিতর দিয়েই পাব, নাচ ছাড়া নয়। নাচ ছাড়া প্রাণের কল্পনা আমি ক'রতে পারি না।

বিশ্ববিদ্যালয় ও নাট্যকলা।

[অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্-এ]

বড় বড় গালভরা নাম নেবার প্রবৃত্তি খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু তা'তে একটু বিপদ আছে—লোকে অধিকার অনধিকারের প্রশ্ন তোলে। গোল-দীঘির ধারের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটির আমরা নাম দিয়েছি—'বিশ্ববিদ্যালয়'। বেশ জমকালো নাম! আর এমন একটা নামযুক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা যে খুব গর্ব্বের বিষয়, তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু গোল বাধে তখন, যখন কেউ প্রশ্ন কোরে বসে, "বাপু, নাম ত নিয়েছ প্রকাণ্ড, কিন্তু নামের মত কাজ কি ক'রছ বলত? ডাক্তার, কেরানী গ'ড়ে তোলাই যার প্রধান কাজ, তার 'বিশ্ববিদ্যালয়' নামটা কি কাণা ছেলের পদ্মলোচন নামের মত শোনায় না?" কথাটা যে অনেক পরিমাণে সত্য, তা' অস্বীকার ক'রবার উপায় নেই। বিশ্ববিদ্যালয় তাকেই বোল্‌তে পারা যায়, যেখানে ষোল আনা মানুষ গড়বার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা ও পরীক্ষা-প্রণালী আলোচনা কোরলে বোধ হয়, যেন কেবল স্মরণশক্তির ও কতক পরিমাণে বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের জন্যেই এত বড় বিদ্যায়তনটি স্থাপিত হ'য়েছে। পুরা মানুষ গ'ড়তে হোলে যে তার অন্যান্য বৃত্তিগুলিরও বিকাশ সাধনের দরকার—এটা যেন কর্তৃপক্ষগণের মনে থাকে না। এমন কি সময়ে সময়ে তাঁরা এমন সব কাজ ক'রে বসেন যে, তাঁদিগকে এ চেষ্টার বিরোধী ব'লেই বোধ হয়। এই সেদিন তাঁরা আদেশ জারি ক'রে বসলেন যে, স্কুলের শিক্ষকেরা ছাত্রদের কোনরূপ অভিনয়াদিতে যোগ দিতে পাবেন না। অথচ অভিনয়াদির সাহায্যে লোকশিক্ষা দানই ছিল এদেশের চিরন্তন প্রথা। সরকারী বিবরণ অনুসারে এদেশের লোকেরা

নিরক্ষর হোলেও যে তারা মূর্খ নয়, এ জিনিষ সম্ভব হ'য়েছে মাত্র এই প্রথা প্রচলিত ছিল ব'লে। এখানকার নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর লোকেরও মুখে যে সকল উচ্চ ভাবের ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কথা শুনতে পাওয়া যায়, তা পাশ্চাত্য দেশের উচ্চতর শ্রেণীর অনেক শিক্ষিত লোকেরও জ্ঞানাতীত। কিন্তু আমরা এখন জনশিক্ষার সেই সুন্দর প্রাচীন প্রণালী ত্যাগ ক'রে ইউরোপের অনুকরণে 'বাধ্যতামূলক সার্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা' প্রচলন করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়েছি। এ মনোবৃত্তিকে অন্ধ মোহ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

যে শিক্ষা বুভুক্ষু হৃদয়কে উপবাসী রেখে কেবল মস্তিষ্কের একটা দিকের পরিপুষ্টি সাধন ক'রতে চেষ্টা করে, তাকে শিক্ষা না বোলে শিক্ষার বিকার বলাই উচিত। মস্তিষ্কের এরূপ বিবৃদ্ধি প্লীহা বা যকৃত বৃদ্ধির মত একটা রোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। বিশ্ববিদ্যালয় এই সহজ সত্য কথাটা কবে বুঝবেন? মানি, কয়েক বৎসর হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিষয়ে একটি অধ্যাপক পদের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সে অধ্যাপক গোটা কয়েক বক্তৃতা দিয়েই খালাস। অন্যান্য বিষয়ের মত কলাবিদ্যার রীতিমত অধ্যাপনা বা পরীক্ষা গ্রহণের কোন ব্যবস্থা নেই। সুতরাং যে সকল বক্তৃতা শোনবার জন্য অতি অল্প ছাত্রেরই আগ্রহ দেখা যায়; আর তা শুনেও যে বিশেষ ফললাভ হয়, এম নত' বোধ হয় না।

সুখের বিষয়, এতদিনের পর তরুণদলের একজন শ্রেষ্ঠ নেতার হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতার ভার প'ড়েছে। তিনি কেবল বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান নন, তাঁর চিত্তের সরসতা এখনও পর্য্যন্ত অবিকৃত আছে। তিনি নাটক ও নাট্যকলাদির যথেষ্ট অনুরাগী এবং এ বিষয়ে উৎসাহদান করতে তিনি সকল সময়েই প্রস্তুত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যেও সঙ্গীতভক্ত বা নাট্যকলানুরাগীর অভাব নেই। এর একটা প্রমাণ আমি কিছুদিন আগে পেয়েছিলুম। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে বি, টি এবং এল, টি পরীক্ষার ব্যবস্থাগুলির সংস্কার করবার জন্যে একটা কমিটি গঠিত হয়। সে কমিটির আমি একজন সদস্য ছিলুম। আমি সে সময়ে উক্ত পরীক্ষা-দ্বয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট বিষয়গুলির মধ্যে সঙ্গীতকেও স্থান দেবার জন্যে প্রস্তাব করি। সে প্রস্তাব কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করেন এবং সেনেট সভাতেও তা' পাশ হয়ে যায়। অতএব দেখা যাচ্ছে, আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে নাট্যকলাদির অধ্যাপনা ও উপাধি-পরীক্ষা প্রবর্ত্তনের আশা দুরাশা নয়

শুনতে পাই, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমে গঠিত হয়েছিল। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য ইংলণ্ডের একটা শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় নয়; কিন্তু বোধ হয়, প্রথম অবস্থায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এর চেয়ে উচ্চতর আদর্শ গ্রহণ করার সামর্থ্য ছিল না। ফলে শিক্ষালয়ের নাম ক'রে একটা পরীক্ষালয় মাত্র স্থাপিত হয়েছিল। তারপর এক শতাব্দীর চার ভাগের তিন ভাগ কেটে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়টির ভালমন্দ অনেক পরিবর্তনও সাধিত হয়েছে। বর্ত্তমানকালে আশুবাবুর মত একজন মহাশক্তিমান পুরুষের হাতে প'ড়ে এর ভোল ত একেবারেই ফিরে গেছে। কিন্তু এখনও অনেক বাকি। আশা করা যায়, পিতা যে কাজ শেষ ক'রে যেতে পারেন নি, সুযোগ্য পুত্র তা' সম্পন্ন করবেন। 'পুত্রাৎ ইচ্ছেৎ পরাজয়ম্'।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ও এতকাল চুপ ক'রে ব'সে থাকে নি। নানা দিকে তারও অনেক উন্নতি হয়েছে। তার মধ্যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নাট্যকলা বিষয়ে উপাধি-পরীক্ষার জন্য সেখানে যে ব্যবস্থা হয়েছে, সেইদিকে আমি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের—বিশেষতঃ আমাদের নবীন ভাইস্‌চ্যান্সেলার মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রতে চাই। পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য আমি সংক্ষেপে সেই ব্যবস্থার কথা এখানে বিবৃত করছি।—

উপাধিপ্রার্থীদিগকে প্রথমে দুই বৎসরকাল কোনও ট্রেনিং স্কুলে স্বর-বিজ্ঞান, স্বর-সাধনা, আবৃত্তি, অঙ্গভঙ্গি, নৃত্য এবং অভিনয় সম্বন্ধে পাঠাভ্যাস করতে হয়। তারপর তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেবার অধিকার পায়। এই পরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্দ্দিষ্ট হয়েছে :— ইংরেজী কাব্য, নাটকের ইতিহাস ও একটা বিদেশী ভাষা। অভিনয় ও তা ছাড়া অভিনয়কলার ইতিহাস, সুরবোধ ও মঞ্চশিল্পে প্রযুক্ত পদার্থ-বিজ্ঞান (physics as applied to stage-craft) এই তিন বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর যিনি নাট্যকলা বিষয়ে শিক্ষকতা করতে চান, তাঁকে আর এক বৎসর নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অধ্যয়ন করতে হয়,—যথা, (উচ্চতর) স্বরবিজ্ঞান ও স্বরসাধনা, কণ্ঠস্বর, অঙ্গভঙ্গি, ও শব্দ-উচ্চারণ সম্বন্ধ শরীর-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান, আবৃত্তি-বিজ্ঞান, প্রযোজনা-কলা, শিক্ষাদান প্রণালী প্রভৃতি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাটি যে সহজ নয়, তা' নিম্নলিখিত "সিলেবাস"টি দেখলেই বোঝা যায়—

(১) ইংরেজী কাব্যের গতি ও প্রকৃতি—নির্ব্বাচিত কয়েকটি ইংরাজী কবিতা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান।

(২) নাটকের সাধারণ ইতিহাস, সেক্সপীয়ারের নাটকাবলী এবং আরও কয়েকটি নির্ব্বাচিত নাটক। কয়েকটি বিশেষ নাটকের ভাষা, ভাব, শিল্প, চরিত্রাঙ্কণাদি সম্বন্ধে আলোচনা।

(৩) ফরাসী ভাষা; নির্ব্বাচিত কয়েকটি ফরাসী নাটক।

(৪) অভিনয়কলার ইতিহাস—নাটক রচনার সময়ের সামাজিক জীবন রীতিনীতি, বেশভূষা প্রভৃতির জ্ঞান।

(৫) সরল সঙ্গীত-বিজ্ঞান।

(৬) মঞ্চশিল্পে প্রযুক্ত পদার্থ-বিজ্ঞান।

(৭) স্বর-বিজ্ঞান।

(৮) স্বর সাধনার প্রণালী।

(৯) অঙ্গের গতি, কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণ সম্বন্ধে শরীর-বিজ্ঞান।

(১০) উপরিউক্ত ব্যাপারগুলি সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞান।

পরীক্ষার বিষয়গুলি আলোচনা ক'রলে দেখা যায় যে, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবেই উপলব্ধি করেছেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা ত এ সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ সহজেই ক'রতে পারেন। অবশ্য ওখানকার সিলেবাসের কিছু অদল বদল ক'রে নিতে হবে। কিন্তু লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা একটা মস্ত ভুল করেছেন। তাঁরা ভুলে গেছেন যে, শুধু পরীক্ষার পাশ হয়ে উপাধি গ্রহণ ক'রতে পারলেই বড় অভিনেতা হওয়া যায় না। এর জন্যে রীতিমত ব্যবহারিক শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন। সেইজন্য পাঠাভ্যাসের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে অভিনয় করা দরকার। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা যদি নাট্যকলা বিষয়ে অধ্যাপনার ব্যবস্থা করেন, তা হ'লে এরূপ অভিনয়ের ব্যবস্থাও তাঁরা অতি সহজে ক'রতে পারেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যকলাশিক্ষার প্রবর্ত্তন হওয়ার আবশ্যকতা আছে। এবং সেই কারণেই আমরা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ আমাদের কর্তৃপক্ষের চোখের সামনে তুলে ধরলুম। আমাদের এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হবার আশা কি একান্তই সুদূরপরাহত?

রস-বিকার

(শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী)

চিন্তা করলে বোঝা যায়, মানুষের প্রাণে রসের ভাণ্ডার চিরদিনই অন্তর্নিহিত আছে। নাটকের সৃষ্টি হবার পূর্ব্বেও এমন অনেক রসিক ছিলেন, যাঁদের প্রাণ রসে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁরা তাঁদের রসের অংশ অন্য রসিকদের পরিবেশন করবার জন্যে যখন ব্যাকুল হ'য়ে উঠলেন, তখন নৃত্তে, নৃত্যে, অঙ্গে ও বচনে নাটকের বস্তু নিবদ্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ ক'রলো। শিল্পীর অন্তরের প্রকাশ প্রথম সেই শিল্পীকেই মুগ্ধ করলে। পরে সে তাকে বাহিরের রূপ দিয়ে সেই রসের রসিকদের সুপ্ত রসকে জাগিয়ে তুলে তাদের প্রাণে আনন্দ দান করলে।

রসই নাটকের প্রাণ। ভারতের চিন্তার ধারা পাশ্চাত্য জগতের চিন্তার ধারা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং উভয়ের রসের প্রকাশধারাও বিভিন্ন। ভারতের সভ্যতা গ'ড়ে উঠেছিল ত্যাগে, ভোগে নয়, আত্মার কল্যাণকল্পে—ধ্বংশের জন্য নয়। তাই তাঁরা তাঁদের শাস্ত্রে ও সাহিত্যে ত্যাগের আদর্শই প্রচার ক'রে গেছেন। একথা অস্বীকার করলে চলবে না যে, অভিনয় জিনিষটা বেদ, দর্শন, ইতিহাস ও অন্যান্য শাস্ত্রের রহস্যকে মানুষের চোখের সামনে মূর্ত্ত করে। ইহা একাধারে বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, মঠ ও সভা। অনেক অধ্যয়নের জ্ঞান, অনেক পর্য্যটনের অভিজ্ঞতা ইহার সরস প্রণালীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। অতএব এমন রসের সৃষ্টি ইহার করা উচিত, যাতে মানুষ ও সমাজ গ'ড়ে উঠে—তাদের কল্যাণ হয়।

আধুনিক যুগে প্রায় অধিকাংশ মানুষেরই প্রাণের রস শুকিয়ে গেছে; তাই আজকালকার প্রচলিত উপন্যাস প'ড়ে অথবা রঙ্গালয়ে বা চিত্রগৃহে অভিনয় দেখে মনে হয়, আমরা নিতান্ত কাঙ্গাল। আজকালকার সাধারণও যেমন ভাবের দিক দিয়ে দীন হীন, আমাদের শিল্পসৃষ্টিও তেমনি দীন হীন। এখন অধিকাংশ শিল্পী, হয় নিজের গুণপনা প্রকাশ করতে ব্যস্ত, নয় সংসারের দুঃখ বেদনা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে অতিমাত্রায় সচেষ্ট। কল্পনাপটে নিজের নিত্যজীবনের চিত্র দেখে শিল্পী তৃপ্তি পান না; তাই আপনার অভীষ্ট রূপকে তাঁর শিল্পে ফুটিয়ে তোলেন। শিল্পকে মঙ্গল ও প্রেমের জন্য যে আত্মা না চায়, যে শুদ্ধ ভোগের জন্য তা খোঁজে, আমার ধারণায় সে আত্মার অধোগতি হয়। শিল্পীর সাধনা যদি ভোগের দিক দিয়ে গ'ড়ে ওঠে, তার সৃষ্ট বস্তু জগতের কল্যাণে লাগে না, তার মধ্যে পবিত্রতা থাকে না, স্বভাবের সহজ আনন্দ থাকে না, তার মধ্যে যথার্থ রসের সন্ধান মেলে না।

দেশ কাল পাত্রের দোষ গুণ এড়িয়ে, বিচারে যা কল্যাণকর, শুধু তাই গ্রহণ ক'রে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখায় ভগবৎ কৃপার প্রয়োজন, একথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু মানুষেরও এদিকে চেষ্টা করা উচিত। আমরা অভাগা পরাধীন জাতি। মুখে আমরা যতই স্বদেশের উপর ভক্তি বা প্রেম দেখাই না কেন, আমাদের মনটা বিজাতীয়ভাবে পূর্ণ। তাদের আচার ব্যবহার, তাদের সাহিত্য, তাদের শিল্প সকলই আমাদের মজ্জায় মজ্জায় ব'সে গেছে। আমরা বিজাতীয় শিল্পকে আমাদের শিল্পের উপরে আসন দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করি। তাই তাদের শিল্পে যে রস পাই—রস বলব না, বললে ভুল বলা হবে—যে ভাব পাই, সেই ভাবই আমরা সাদরে গ্রহণ করি ও পোষণ করি। বিচার করি না যে, এভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে, অভাগা আমরা, কোন্ নিম্নস্তরে আমাদের আত্মাকে ও সমাজকে পাতিত করছি।

চিত্রগৃহে সাধারণত যে সকল বিদেশী ছবি আজকাল চলে এবং আমরা

যাদের সুখ্যাতি ও পোষকতা করি, সে দেশের ভাষায় তার নাম Picture with Sex-appeal। চিত্রগৃহে বা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যে রস বিতরিত হয়, তা আমরা পিতা, পুত্র, মাতা, কন্যা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি সকলে একত্র হ'য়ে দেখতে যাই ও উপভোগ করি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, Sex-appeal—অবশ্য আমাদের দেশের ছবিতে যা পাই, তাকে Sex-repel বললে বোধ হয় কিছু দোষের হয় না—কোন্ রসের অন্তর্গত? নিশ্চয়ই "শৃঙ্গার" রস। শৃঙ্গার রস মধুর রসের পর্য্যায়ভুক্ত। শাস্ত্রে বিবৃত আছে, ইহা আদি রস। স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের অনুরাগ থেকে ইহার উৎপত্তি। অনুরাগ ইহার স্থায়ীভাব। উত্তম প্রকৃতির নায়ক নায়িকা এই রসের অবলম্বন বিভাব (পরিচয়) এবং অনুরাগোদ্দীপক বিষয় ইহার উদ্দীপন বিভাব। অলঙ্কার শাস্ত্রে এই রসকে শ্যামবর্ণ ও বিষ্ণুদেবত বলেছে; অর্থাৎ ইহার অধিষ্ঠাতা যে দেবতা, তিনি হচ্ছেন "বিষ্ণু"। আগেই বলেছি, পাশ্চাত্য জগতের চিন্তার গতি, এ দেশের থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সুতরাং এটা খুবই স্বাভাবিক যে, আমরা এ রসের বিকৃতিই তাদের কাছ থেকে পাব। হিন্দুরা "বিষ্ণু"কে যে রসের অধিষ্ঠাতা দেবতা ক'রেছেন—আজ ভোগের চিন্তা, অতীব মধুর "মধুর রসকে" কোন্ বিপথে নিয়ে যাচ্ছে, তা একটু চোখ চাইলেই আমরা দেখতে পাই।

মানুষ দেবতা ও পশুর সংমিশ্রণ। সে কারণে কতকগুলি দেবভাব যথা—দয়া, ধর্ম্ম, দাক্ষিণ্য, তিতিক্ষা প্রভৃতি ও কতকগুলি পশুভাব যথা—কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি মানুষের ভিতরে আছে। এই দুই ভাব সর্ব্বদাই বিপরীতমুখী, সুতরাং সর্ব্বদাই এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে; অসুরের সঙ্গে সর্ব্বদাই সংসার-ক্ষেত্রে দেবতার রণ লেগে আছে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় অসুরের জয় ও দেবতার পরাজয়। কিন্তু মানুষের ভিতরে আর একটি মহান বস্তু আছে, যাকে আমাদের শাস্ত্রকারেরা "শক্তি" বা "কুলকুণ্ডলিনী" বলেন। যখন মানুষের মনের দেবভাব, পশুভাব বা অসুরভাবের কাছে পরাস্ত হ'য়ে সেই শক্তিরূপিনী দেবীর শরণাপন্ন হয়, তখনই কেবল দেবী প্রকট হ'য়ে অসুররূপী ভাব সকলকে নষ্ট করেন।

আজ জগৎ সভ্য, সুতরাং আমরাও সভ্য; অতএব আমাদের শিক্ষা দীক্ষা চিন্তা সবই সত্য। কিন্তু আমি শুধু একটা প্রশ্ন ক'রে এ প্রবন্ধ শেষ ক'রবো। "Sex-appeal" সংক্রান্ত ছবি বা নাটক যখন ছবিঘরে বা রঙ্গালয়ে দেখি, তখন আমাদের মনের মধ্যে কী ভাবের উদয় হয়? শক্তিশালী অভিনেতা-অভিনেত্রীর সৃষ্ট জীবন্ত কামচিত্র অজানতে দর্শকের মনে প্রবেশ কোরে তার ভিতর কোন্ ভাবের উদ্দীপনা এনে দেয়? দর্শকের অন্তর্নিহিত ঘুমন্ত পশু-বৃত্তিগুলিকে আঘাত ক'রে জাগিয়ে তুলে তার মন ও আত্মাকে কোন্ আদিম যুগের বর্ব্বরতার মাঝে নিয়ে যায়? এই সভ্যযুগে আমরা কি আমাদের অন্তরের অসুরবৃত্তিরই অনুশীলন করব? আমাদের ভিতরের দেবভাবগুলি কি মহাদেবী "শক্তি"র আশ্রয় নিয়ে সমাজের অকল্যাণকর, মানুষের আত্মার অধোগতির পথ নিরোধের চেষ্টা করবে না?

প্রাচীন ভারতের প্রেক্ষাগৃহ

[অধ্যাপক শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী, বেদান্ততীর্থ,
এম্-এ, পি-আর্-এস্]

মহর্ষি ভরত "নাট্যশাস্ত্রে" প্রেক্ষাগৃহের ত্রিবিধ সন্নিবেশের উল্লেখ করিয়াছেন—

(১) **বিকৃষ্ট**—বিভাগতঃ কৃষ্ট অর্থাৎ দীর্ঘ—চারিদিকে সমান নহে। পরিষ্কার বাঙ্‌লায় সমকোণ চতুর্ভুজাকৃতি (rectangular)—সমচতুরস্র (square) নহে। বিস্তৃতি অপেক্ষা দৈর্ঘ্য অধিক।

(২) **চতুরস্র**—এস্থলে চতুরস্র বলিতে সমচতুরস্রই বুঝিতে হইবে। সমকোণ সমচতুরস্র (square)।

(৩) **ত্র্যস্র**—ত্রিভুজাকার—সমত্রিকোণ—সমত্রিবাহুক (equilateral triangle)।

কোন কোন আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ব্যাখ্যাতা বিকৃষ্ট বলিতে "অণ্ডাকৃতি" (ellipse) বুঝিয়াছেন। কিন্তু নাট্যশাস্ত্রের মূলে অথবা অভিনব গুপ্তের টীকায় কোথাও এরূপ অর্থের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।

কিন্তু "শারদাতনয়" তাঁহার "ভাবপ্রকাশন" গ্রন্থে যে ত্রিবিধ রঙ্গমণ্ডপের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে বৃত্ত রূপ রঙ্গমণ্ডপের কথা আছে। তাঁহার মতে বৃত্ত, চতুরশ্র ও ত্র্যশ্র ভেদে রঙ্গমণ্ডপ ত্রিবিধ। অবশ্য এই "বৃত্ত" বলিতে যে বৃত্তাকৃতি রঙ্গমণ্ডপকেই বুঝাইতেছে, এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। কারণ, শারদাতনয় "বৃত্তাখ্য" অর্থাৎ বৃত্ত নামক রঙ্গমণ্ডপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণের সকল সন্দেহ দূর করিবার জন্য তৎকর্তৃক বর্ণিত ত্রিবিধ রঙ্গমণ্ডপের লক্ষণগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

(১) **বৃত্ত**—বারকন্যা, অমাত্য, বণিক্, সেনাপতি, সুহৃৎ ও সুতগণ সহ রাজা যথায় সঙ্গীত-অভিনয় ইত্যাদির প্রয়োগ করেন বা করান, তাহাই "**বৃত্তাখ্য**" রঙ্গমণ্ডপ।

(২) **চতুরশ্র**—ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য ও অন্তঃপুরিকাগণ সহ যথায় রাজার সঙ্গীতাদির প্রয়োগ হয়, তাহাই "**চতুরশ্র**" রঙ্গমণ্ডপ।

(৩) **ত্র্যশ্র**—রাজা যথায় মহিষীগণ সহ সঙ্গীতাভিনয় করেন, তাহাই "**ত্র্যশ্র**" রঙ্গমণ্ডপ।

শারদাতনয়ের এই বিবরণ সম্পূর্ণ মৌলিক। "নাট্যশাস্ত্র" বা অন্য কোন নাট্যকলা প্রতিপাদক প্রাচীন গ্রন্থে ইহার অনুরূপ বিবরণ পাওয়া যায় না। যাহা হউক, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে নাট্যশাস্ত্রোক্ত বিবরণের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিব।

নাট্যশাস্ত্রে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ সন্নিবেশ ছাড়া ত্রিবিধ প্রমাণ বা পরিমাপেরও উল্লেখ আছে—

(১) জ্যেষ্ঠ, (২) মধ্যম, ও (৩) কনিষ্ঠ।

নাট্যশাস্ত্রের একটি পাঠান্তর (নাট্যশাস্ত্র, বরোদা সংস্করণ, অধ্যায় ২, শ্লোক ১২-১৪, পৃঃ ৫১, ও শ্লোক ২৪-২৬, পৃঃ ৫৪-৫৫) এমন আছে, যাহাতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, বিকৃষ্টের প্রমাণ জ্যেষ্ঠ, চতুরস্রের মধ্যম ও ত্র্যস্রের কনিষ্ঠ। এ যাবৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রায় সকল পণ্ডিতই এই মতের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিত ডক্টর আর্থার বেরিডেল্ কীথ্ তাঁহার "The Sanskrit Drama" নামক গ্রন্থে (পৃঃ ৩৫৯) এই মতই উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু নাট্যশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ টীকা "অভিনব ভারতী" গ্রন্থের রচয়িতা সুবিখ্যাত শৈবাচার্য্য ও আলঙ্কারিক আচার্য্য অভিনব গুপ্ত (খ্রীঃ ১০ম শতাব্দী) এ পাঠান্তরটির প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই। আচার্য্যপাদ যুক্তিসহকারে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে—বিকৃষ্ট, চতুরস্র ও ত্র্যস্র—ইহাদের প্রত্যেকটিই জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে ত্রিবিধ অতএব, প্রেক্ষাগৃহের **নয়** প্রকার ভেদই শাস্ত্রসম্মত। এই নববিধ প্রেক্ষাগৃহের প্রত্যেকটি আবার হস্ত ও দণ্ড (= ৪ হাত) প্রমাণ ভেদে দ্বিবিধ। আর এজন্য রঙ্গালয়ের আকৃতিগত মোট ভেদ—**অষ্টাদশ** প্রকার।—

(১) জ্যেষ্ঠ বিকৃষ্ট—১০৮ হাত দীর্ঘ। বিস্তার ইহা অপেক্ষা অল্প। ঠিক কত হাত তাহার উল্লেখ নাই। কেহ কেহ অর্দ্ধেক (৫৪ হাত) ধরেন। (১০৮ × ৫৪)।

(২) জ্যেষ্ঠ চতুরস্র—প্রতি পার্শ্ব ১০৮ হাত (১০৮ × ১০৮)।

(৩) জ্যেষ্ঠ ত্র্যস্র—প্রতি ভুজ ১০৮ হাত।

(৪) মধ্যম বিকৃষ্ট—৬৪ হাত দীর্ঘ ; ইহার বিস্তার ৩২ হাত বলিয়া উল্লেখ আছে (নাঃ শাঃ ২।২০)। (৬৪ × ৩২)।

(৫) মধ্যম চতুরস্র—প্রতি পার্শ্ব ৬৪ হাত (৬৪ × ৬৪)।

(৬) মধ্যম ত্র্যস্র—প্রতি ভুজ ৬৪ হাত।

(৭) কনিষ্ঠ বিকৃষ্ট—৩২ হাত দীর্ঘ। বিস্তারের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও ১৬ হাত ধরা অসঙ্গত হইবে না। (৩২ × ১৬)।

(৮) কনিষ্ঠ চতুরস্র—প্রতি পার্শ্ব ৩২ হাত (৩২ × ৩২)।

(৯) কনিষ্ঠ ত্র্যস্র—প্রতি ভুজ ৩২ হাত।

নাট্যশাস্ত্রে এই যে অষ্টাদশবিধ প্রেক্ষাগৃহের কথা বলা হইয়াছে, ইহাদের প্রত্যেকটিই যে সকলের ব্যবহারের উপযুক্ত—এরূপ মনে করা উচিত নহে। শাস্ত্রে এই অষ্টাদশ ভেদের কথা কেবল সম্প্রদায়ের অবিচ্ছেদরক্ষার্থ উক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোনটি কোন এক বিশেষ গোষ্ঠীর পক্ষে কার্য্যকরী হইতে পারে। কিন্তু অধিকারিভেদে ব্যবস্থাভেদ শাস্ত্রের মূল উপদেশ। স্থান-কাল-পাত্রানুসারে নিজ ব্যবহারের উপযোগী পরিমাপবিশিষ্ট প্রেক্ষাগৃহ নির্ব্বাচন করিয়া না লইলে অভিনয়ে সাফল্যের আশা সুদূরপরাহত হইয়া থাকে।

নাট্যশাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে যে, এই সকল রঙ্গালয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পরিমাণটি কেবল দেবগণের উপযোগী ; মধ্যম পরিমাণ নৃপতিগণের ব্যবহার্য্য ; ও কনিষ্ঠ পরিমাণ অবশিষ্ট জনসাধারণের যোগ্য (নাঃ শাঃ ২।১১)। মূল শ্লোকটি একটু অস্পষ্ট হইলেও একেবারে দুর্ব্বোধ্য নহে। সাধারণতঃ শ্লোকটির নিম্নলিখিতরূপ অর্থ করা হইয়া থাকে—

জ্যেষ্ঠ পরিমাণের প্রেক্ষাগৃহ দেবলোকেই প্রচলিত ছিল। নৃপতিগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত বা রাজকীয় সাহায্যপুষ্ট রঙ্গালয়গুলির পরিমাণ হইত মধ্যম। আর সাধারণ জনগণ কনিষ্ঠ পরিমাণের রঙ্গগৃহ ব্যবহার করিতেন।

আপাতদৃষ্টিতে পূর্ব্বোক্ত অর্থটি বেশ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। আর কীথ্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য গবেষকবৃন্দ এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আচার্য্য অভিনবগুপ্ত ইহা অপেক্ষাও গূঢ়তর ও যুক্তিপূর্ণ অর্থের ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, উক্ত শ্লোকটির অর্থ এরূপ **নহে**।—

"যথায় দেবগণ প্রেক্ষক, তথায় রঙ্গগৃহের পরিমাপ জ্যেষ্ঠ ; যথায় নৃপগণ দর্শক, তথায় রঙ্গালয় মধ্যম পরিমাণ ; আর যেখানে জনসাধারণ দর্শক, তথায় প্রেক্ষাগৃহ কনিষ্ঠ পরিমাণের হওয়া উচিত"।—

এরূপ অর্থ যাঁহারা করিয়া থাকেন, অভিনবগুপ্তের মতে তাঁহারা ভরতের নিগূঢ় অভিপ্রায় ধরিতেই পারেন নাই। অবশ্য দেববৃন্দ যথায় প্রেক্ষক, তথায় রঙ্গগৃহ যে বৃহদাকার হইবে—ইহার তবু একটা যুক্তি

আছে। কিন্তু নৃপতি দর্শক হইলে রঙ্গালয় হইবে মধ্যম পরিমাণের এবং জনসাধারণ দর্শক হইলে প্রেক্ষাগৃহ হইবে কনিষ্ঠ পরিমাণের—এইরূপ নিয়মের মধ্যে কোন যুক্তি আছে কি? বরং যথায় নৃপতি স্বয়ং দর্শক, তথায় অন্য প্রেক্ষকের সংখ্যা নিশ্চয়ই নির্ব্বাচিত ও অল্প হইয়া থাকে। অতএব, সে ক্ষেত্রে রঙ্গগৃহ কনিষ্ঠ পরিমাণের হইলেই ভাল হয়। পক্ষান্তরে, সাধারণ রঙ্গালয় বৃহদাকার হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কারণ, ঐরূপ ক্ষেত্রে দর্শকের সংখ্যা অত্যধিক হইয়া থাকে। সেজন্য কনিষ্ঠ পরিমাণের প্রেক্ষাগৃহে সাধারণ দর্শক সকলের স্থান সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব। অতএব, পূর্ব্বোক্ত আপাতলভ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া অভিনবগুপ্ত-সম্মত গূঢ়ার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য বহুবিধ। নাট্যশাস্ত্র দশবিধ "রূপকে"র (রূপক=দৃশ্য-কাব্য, **Drama**; allegory নহে) উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল দৃশ্যকাব্যের মধ্যে কতকগুলি রূপকের পাত্রপাত্রী দেবযোনিবহুল (যেমন সমবকার, ডিম প্রভৃতি রূপক)। কতকগুলি দৃশ্যকাব্যের নায়কাদি নৃপতি প্রভৃতি। আবার কতকগুলির পাত্রপাত্রী সকলেই সাধারণ নরনারী। যে সকল রূপকের নায়ক, প্রতিনায়ক ও অন্যান্য পাত্রপাত্রীর অধিকাংশ-গুলিই দেব, অসুর, যক্ষ, রক্ষঃ প্রভৃতি—যাহাতে মায়া, ইন্দ্রজাল, যুদ্ধ প্রভৃতি অদ্ভুত ও উৎকট দৃশ্য দেখান প্রয়োজন—রৌদ্র, বীভৎস, অদ্ভুত প্রভৃতি রস ও আরভটী বৃত্তির যাহাতে প্রাধান্য—সেই সকল রূপকের অভিনয়ে "পীঠমায়া"র (stage-illusion) সৃষ্টির নিমিত্ত সুবিস্তৃত রঙ্গমঞ্চ ও বিরাটকায় প্রেক্ষাগৃহের প্রয়োজন। অতএব, এই সকল রূপকাভিনয়ের জন্য ১০৮ হাত পরিমাণের জ্যেষ্ঠ রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন হয়। পক্ষান্তরে নাটক প্রভৃতি দৃশ্যকাব্যের (যাহার নায়ক নৃপাদি, রস শৃঙ্গার, বীর বা শান্ত) অভিনয় অতি বিস্তৃত জ্যেষ্ঠ পরি-মাণের রঙ্গালয়ে চলিতে পারে না। আবার অতি ক্ষুদ্র কনিষ্ঠ পরিমাণের প্রেক্ষাগৃহেও রাজকীয় ঐশ্বর্য্যাদির রূপ-কল্পনা করা সম্ভবপর নহে। সেজন্য "নৃপপ্রকৃতিক" নাটকাদি দৃশ্যকাব্য অভিনয়ের উপযোগী হইতেছে মধ্যম পরিমাণের রঙ্গগৃহ—একথা শাস্ত্রে বলা হইয়াছে। আর সাধারণ পাত্র-প্রধান অনাড়ম্বর দৃশ্যকাব্যগুলির (যথা ব্যায়োগ, প্রহসন ইত্যাদি) অভিনয়ার্থ কনিষ্ঠ পরিমাণের রঙ্গগৃহগুলি নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য।—ইহাই নাট্যশাস্ত্রের সুগূঢ় অভিপ্রায়।*

এই অর্থই যে সঙ্গত, আচার্য্য অভিনবগুপ্তপাদ অখণ্ডনীয় যুক্তি সহকারে তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। যেস্থলে দেবগণ প্রেক্ষক, সেই রঙ্গগৃহ যে জ্যেষ্ঠ পরিমাণের—এরূপ কল্পনাও অতি অসঙ্গত। কারণ মহর্ষি ভরত স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, সাত্ত্বিক প্রকৃতিসম্পন্ন ও মানসী সৃষ্টিতে সমর্থ দেবগণ কোন বিধিনিষেধের অধীন নহেন। তাঁহাদের ভোগদেহ কর্ম্ম-দেহ নহে। তাঁহারা পূর্ব্বকৃত পুণ্যের ফল ভোগ করিতে দেবশরীর ধারণ করিয়াছেন। কর্ম্ম করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই। পক্ষান্তরে নরগণ রাজসপ্রকৃতিযুক্ত ও মানসী সৃষ্টিতে অসমর্থ। কর্ম্মদেহধারী বলিয়া তাঁহারাই কেবল সর্ব্ববিধ বিধিনিষেধের অধীন। এই হেতু মানুষনির্ম্মিত

* রূপক দশবিধ—নাটক, প্রকরণ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক (বা উৎসৃষ্টিকাঙ্ক), বীথী, ভাণ, ব্যায়োগ, প্রহসন। ইহাদের পরিচয় ভবিষ্যতে দিবার ইচ্ছা রহিল। সকল নাট্যের মাতৃকাস্বরূপিণী বৃত্তি চতুর্ব্বিধ—কৈশিকী (শৃঙ্গার-প্রধান), আরভটী (রৌদ্র-বীভৎস-প্রধান), সাত্বতী (বীর-অদ্ভুত-প্রধান) ও ভারতী (হাস্য করুণ-শান্ত রস-প্রধান)।

প্রেক্ষাগৃহের লক্ষণই মহর্ষি বলিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন (নাঃ শাঃ ২।২৭-২৮)। অতএব এ প্রসঙ্গে দেবলোকের রঙ্গালয়ের কথাই উঠিতে পারে না।

মহর্ষি ভরত স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, প্রেক্ষাগৃহের এতগুলি বিভিন্ন ভেদের মধ্যে মধ্যম পরিমাণটিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। কারণ, একমাত্র উহাতেই পাঠ্য (অভিনেয়) ও গেয় বস্তু অতিশয় সুখশ্রাব্য হইয়া থাকে। প্রেক্ষাগৃহ অতিমাত্রায় বিস্তৃত হইলে রঙ্গমঞ্চটি পিছনের দর্শকগণের নিকট হইতে বহুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে। এরূপ রঙ্গপীঠে নাট্যপ্রয়োগ করিলে নটনটীগণের কণ্ঠস্বর প্রেক্ষাগৃহের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছে না; অথবা অতি অস্পষ্টভাবে পৌঁছিলেও ভাবের ভেদ অনুসারে কণ্ঠস্বরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্বরভেদগুলি দূরবর্ত্তী দর্শকগণ ঠিক যথাযথভাবে অনুভব করিতে পারেন না। স্বরের আরোহ, অবরোহ, সমতা, কম্পন, অনুরণন প্রভৃতি সবই দূরে পৌঁছে না, অথবা পৌঁছিলেও বিস্বর শুনায়। আর যদি কোন অভিনেতা রঙ্গগৃহের শেষ প্রান্তে উপবিষ্ট দর্শকগণকে পর্য্যন্ত শুনাইবার উদ্দেশ্যে প্রাণপণপূর্ব্বক তারস্বরে স্বীয় ভূমিকার অভিনয় করেন, তাহা হইলে অতিরিক্ত তীক্ষ্ণতাবশতঃ সে স্বরের স্বাভাবিক মাধুর্য্য হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় স্বর বক্রত হইয়া উঠে। বিশেষতঃ নিকটবর্ত্তী দর্শকগণের তাহাতে কর্ণকুহর-প্রদাহ উপস্থিত হয়। অনুরণনাত্মক মাধুর্য্য ও গম্ভীরতা হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায় দূরবর্ত্তী দর্শকগণের নিকটেও উহা বিস্বর (shrill) বোধ হয়। পক্ষান্তরে, প্রেক্ষাগৃহ অতি ক্ষুদ্র হইলে স্বর অতি সহজেই রঙ্গমঞ্চ হইতে বহির্নিঃসৃত হয়। কাজেই রঙ্গপীঠ মধ্যে স্বরের প্রতি-ধ্বনির অভাবে অনুরণন হইতে পায় না। অনুরণন না হইলে স্বরের মাধুর্য্য বা গাম্ভীর্য্য কিছুই অনুভূত হয় না। ইহাতেও স্বর বিস্বর (flat) বোধ হয়। তাহা ছাড়া অতি বৃহৎ রঙ্গালয়ে অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের মুখগত ভাবের বিকাশ (অশ্রু, স্বেদ, বৈবর্ণ্য, স্তম্ভ, কম্প ইত্যাদি) ও ক্ষিপ্র পরিবর্ত্তন, বেশাদির পরিপাট্য ও বৈশিষ্ট্য দূরবর্ত্তী দর্শকগণের চক্ষুতে স্পষ্ট না পড়ায় অভিনয় সকলকে সমভাবে আনন্দদানে সমর্থ হয় না। অতএব, প্রেক্ষাগৃহের মধ্যম পরিমাণই মুনির অভিলষিত। এই মধ্যম পরিমাণের মধ্যে আবার বিকৃষ্ট, হস্তসমাশ্রয় মধ্যম পরিমাণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভরত স্পষ্টই বলিয়াছেন—

নরভূমিকাবহুল দৃশ্যকাব্যের অভিনয়ার্থ ৬৪ হস্ত দীর্ঘ ও ৩২ হস্ত বিস্তৃত প্রেক্ষাগৃহ নির্ম্মাণ করিবে (নাঃ শাঃ ২।২০)।

নাট্যশাস্ত্রে প্রেক্ষাগৃহ নির্ম্মাণের যে পদ্ধতি উক্ত হইয়াছে, তাহা এতই দুর্ব্বোধ্য যে, অভিনবগুপ্তের টীকার সাহায্য লইয়াও উহা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। কারণ, নাট্যালয় নির্ম্মাণের প্রাচীন সাম্প্রদায়িক পদ্ধতি সম্প্রদায়বিচ্ছেদ হেতু আমরা বহুদিন হইল ভুলিয়া গিয়াছি। যাহা হউক, যতদূর বুঝা যায়, তদনুসারে কল্পিত মধ্যম বিকৃষ্ট হস্তসমাশ্রয় প্রাচীন রঙ্গালয়ের একটি নক্সার খসড়া এই সঙ্গে প্রদত্ত হইল।

(লেখকের কল্পনানুসারে গোপাল দে কর্ত্তৃক অঙ্কিত)
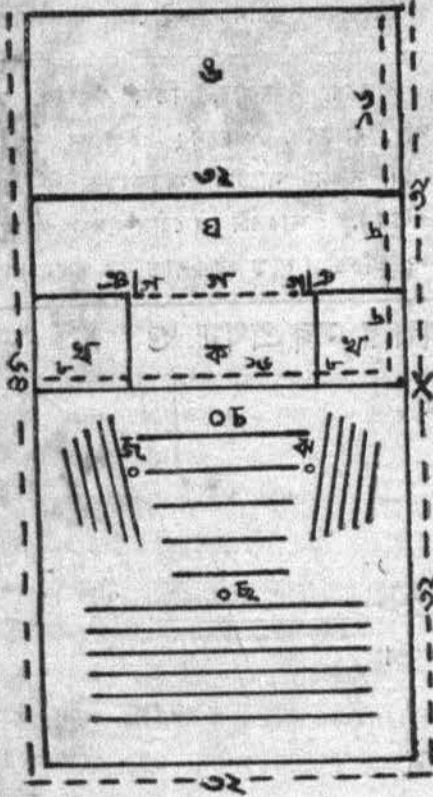
ক = রঙ্গপীঠ (৮×১৬)। খ = মত্তবারণী বা বারান্দা; চতুঃস্তম্ভোপরি স্থাপিত (৮×৮); রঙ্গপীঠ ও মত্তবারণীর উচ্চতা ভূমি হইতে দেড়হাত। গ = রঙ্গশীর্ষের দারুময় ভিত্তি। ইহাতেই নানাবিধ দৃশ্যপট আঁকা থাকিত। তবে সে সব দৃশ্যপট (বা দারুকর্ম্ম) নাড়াচাড়া করা যাইত না। উহা ছিল চিরস্থির। ঘ = রঙ্গশীর্ষ (৮×৩২)। পাত্র-পাত্রীগণের বিশ্রাম-স্থান। উহাতে অনেকটা Wings-এর কাজ চলিত। পূর্ব্বোক্ত কাষ্ঠভিত্তি (গ) উহাকে দর্শকচক্ষুর অন্তরালে রাখিত। এইখানেই বাদ্যভাণ্ড (orchestra) নিবেশ করা হইত। ঙ = নেপথ্য বা সাজঘর (১৬×৩২)। চ = শ্বেতবর্ণ ব্রাহ্মণস্তম্ভ। তৎপশ্চাতে ব্রাহ্মণগণের আসনের সারি। ছ = রক্তবর্ণ ক্ষত্রিয়স্তম্ভ ও তৎপশ্চাতে ক্ষত্রিয়াসন। জ = পীতবর্ণ বৈশ্যস্তম্ভ ও তৎপশ্চাতে বৈশ্যাসন। ঝ = নীলবর্ণ শূদ্রস্তম্ভ ও পশ্চাতে শূদ্রাসন। ঞ = রঙ্গপীঠ হইতে নেপথ্যে যাইবার ও আসিবার দুইটা দ্বার। এই দ্বারমুখে পর্দ্দা বা যবনিকা (জবনিকা) ঝুলান থাকিত। নটনটীগণের মঞ্চে প্রবেশ বা মঞ্চ হইতে প্রস্থানকালে দুইটী সুন্দরী যবনী ঐ যবনিকা সরাইয়া দিত। দ্রুত প্রবেশের সময় নট-নটীগণ নিজেরাই সবেগে ঐ পর্দ্দা সরাইয়া প্রবেশ করিতেন। ঐ ব্যাপারের নাম **"অপটীক্ষেপ"**। মধ্যস্থলে (গ)-চিহ্নিত রঙ্গশীর্ষভিত্তি নানাবিধ দৃশ্যে চিত্রিত বা খোদিত।

(সব পরিমাপ হাতের বুঝিতে হইবে, দণ্ডের নহে।)

শ্রীমতী কাননবালা
(পাইয়োনীয়ারের "মা"-ছবিতে এঁকে দেখতে পাবেন)

বাংলার দুলাল

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত]

প্রথম অঙ্ক

[ব্যারাক-বাড়ীর একটি অপরিসর ঘর। শ্যামল ও পরিতোষ এই ঘরের ভাড়াটে। কেরোসিনের একটা টেবিল ল্যাম্প জালিয়া পরিতোষ নিবিষ্ট মনে চিঠি লিখিতেছে। একটু পরে শ্যামল আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল। পরিতোষ শ্যামলকে দেখিয়া চিঠির প্যাডটা চাপা দিল।]

পরিতোষ। ব্যাপার কি শ্যামল!

শ্যামল। ভাবছিলুম, তোমার ধ্যানে ব্যাঘাত ঘটানো উচিত হবে কিনা।

পরিতোষ। কি সিদ্ধান্তে পৌছুলে?

শ্যামল। বড় ক্লান্ত। ফিরতে আর ইচ্ছে করচেনা।

পরিতোষ। তাহ'লে ফিরোনা। তোমার বিছানা দখল ক'রে দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে নীরবে শুয়ে থাক। আমি নিশ্চিন্তে চিঠি লিখি।

[শ্যামল আসিয়া তাহার শয্যায় চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল।

শ্যামল। হাঁ, তুমি চিঠি শেষ কর।

পরিতোষ। সত্যি সত্যিই যে শুয়ে পড়লে!

শ্যামল। ফ্ল্যাট! গ্যাস সব বেরিয়ে গেছে।

পরিতোষ। একটু চা করব? খাবে?

শ্যামল। তোমার চিঠি?

পরিতোষ। আগে একটু চা করে দি। সত্যিই তুমি বড় ক্লান্ত।

শ্যামল। পুণ্যসঞ্চয়ের প্রতি তোমার দেখ্ চি অসীম আগ্রহ!

[পরিতোষ উঠিয়া ষ্টোভ ধরাইতে ধরাইতে কহিল।

পরিতোষ। তোমার ছাত্র পাশ করেচে?

শ্যামল। না।

পরিতোষ। সে-কি! ফেল করলে?

শ্যামল। একটা ফেলিয়োরকে যে মাষ্টার রাখে, সে কখনো পাশ করে?

পরিতোষ। মাষ্টারটি যখন ছাত্র ছিল, তখন কিন্তু ফেল করতো না।

শ্যামল। সে-খবর তুমি রাখ, আর রাখে য়ুনিভার্সিটির ক্যালেণ্ডার। ছাত্রের অভিভাবক তা রাখেন না।

পরিতোষ। এবার একটু কড়া হোয়ো।

শ্যামল। সে চিন্তা থেকে রেহাই পেয়েচি।

পরিতোষ। তার অর্থ?

শ্যামল। ছাত্রের অভিভাবক আজ আমাকে ডেকে ব'লে দিলেন যে, কাল থেকে আমায় আর যেতে হবে না। তাঁর টাকা আছে ব'লেই যে, তাঁকে একটা অযোগ্য লোককে মাষ্টার রাখতে হবে, তার কোন যুক্তিই তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না।

পরিতোষ। তুমি কিছু বল্লে না?

শ্যামল। বল্লুম বৈকি! বল্লুম—আজ্ঞে হঁ্যা, অযোগ্য জেনেও একজন লোককে মাষ্টার রাখায় শুধু যে টাকারই অপব্যয় আর ছেলেরই মাথা খাওয়া হয়, তা নয়—নীতির দিক দিয়েও তা হয় নিন্দনীয়!

পরিতোষ। এই কথা তুমি বল্লে!

শ্যামল। অন্য কিছু বল্লে কি তিনি খুশী হতেন?

পরিতোষ। নিজের অযোগ্যতা স্বীকার ক'রে এলে!

শ্যামল। করলুমই বা! একান্ত আপন জন যারা, তারাই যখন অযোগ্য ব'লে অবহেলা করে, তখন ফেল-করা ছাত্রের অভিভাবকের ত অযোগ্য বলবার ষোল-আনা অধিকারই আছে।

পরিতোষ। না শ্যামল, তোমার এ-কাজ আমি সমর্থন করতে পারলুম না। অন্তত তোমার ব'লে আসা উচিত ছিল যে, ও-ছেলে কোনকালেও পাশ করতে পারবে না।

শ্যামল। নিজের দেওয়া উপদেশ নিজেই তুমি আজ ভুলে যাচ্ছ, পরিতোষ। মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্—এ কথা যে দিনে দশবার ক'রে তুমি আমাকে শোনাও।

পরিতোষ। তাইত, এখন কি করবে? ওই টিউশানিটাই ত' ছিল একমাত্র অবলম্বন!

শ্যামল। আমরা দু'জনেই অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করেছিলুম। না পরিতোষ?

পরিতোষ। তুমি ত আবার ফার্ষ্ট ক্লাশ!

শ্যামল। সেই সম্মানেরও দাম নেই, দেখচ? এম্নি অশিক্ষিত এই দেশ! কি বল? [শ্যামল হাসিতে লাগিল।

পরিতোষ। হেসে উড়িয়ে দেবার কথা নয়, শ্যামল।

শ্যামল। কাঁদতে পারলেই বোধ হয় একটা কিছু হোতো! কাল থেকে একটা কাজ করব।

পরিতোষ। কি?

শ্যামল। ফুটপাথে ব'সে অন্ধ ভিক্ষুকগুলো যেমন কেঁদে কেঁদে বলে—অন্ধ লাচার বাবা, একটা পয়সা দাও বাবা, তেম্নি আমিও লালদীঘির ধারে ব'সে বলব, ফার্ষ্ট ক্লাস অনার্স গ্র্যাজুয়েট বাবা, দয়া ক'রে একটা চাকরি দাও বাবা। নইলে শুধু যে আমিই না খেয়ে মরব, তা নয়—উচ্চশিক্ষারও অপযশ রটবে, বাবা।

পরিতোষ। নাও, তামাসা রাখ। চা খাও। [পেয়ালাটা তুলিয়া লইল।

শ্যামল। চটলে? তুমিই বা আর বাকী থাকো কেন!

পরিতোষ। সত্যিই, এক এক সময় তোমার ওপর আমার রাগ হয়।

শ্যামল। ভালোই হয়। নইলে অনুরাগ আর থাকতো না।

পরিতোষ। তুমি কোন চেষ্টাই করবে না।

শ্যামল। তোমাকে যে চাকরী পেতে চেষ্টা করতে হয়নি। তাই আজও তোমার বিশ্বাস আছে যে, চেষ্টায় কী না হয়! কিন্তু আমি বার বার চেষ্টা ক'রে দেখেছি, কিছুই হয়নি। তোমাকে বলিনি। কিন্তু সে-দিন তোমার কথা মতো ক্লাইভ ষ্ট্রীটের সেই কাজটার খোঁজে গিয়েছিলুম। আপিসে ঢুকেই আমার চক্ষু চড়ক গাছ। এক পাল লোক, তোমার আমার মতই যুবক, ঠেলাঠেলি করচে, কাকে পেছনে রেখে কে আগে দরখাস্ত পেশ করবে। আর আপিসের দরোয়ান মাঝে মাঝে তেড়ে এসে ধাক্কা দিয়ে

তাদের সরিয়ে দিচ্ছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি তাদের কাণ্ড দেখলুম; তারপর আমার লেখা দরখাস্তখানা পকেট থেকে বার ক'রে কুচি-কুচি ক'রে ছিঁড়ে সেইখানে ছড়িয়ে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লুম। সারাদিন ইডেন গার্ডেনে ব'সে থেকে সন্ধ্যেয় ছেলে পড়িয়ে ফিরে এসে তোমাকে বল্লুম, দরখাস্ত দিয়ে এসেচি। সে-দিন যারা ঠেলাঠেলি ক'রে দরখাস্ত পেশ করতে পেরেছিল, তাদেরই একজন যে চাকরি পেয়েচে, এ-কথা সত্যি। সেই একজন আমিও হয়ত' হ'তে পারতুম। এবং তাই হ'তে চেষ্টাও করেছিলুম। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সফল হলুম না পরিতোষ!

পরিতোষ। হবে কি ক'রে? তুমি যে পালিয়ে এলে!

[এক চুমুক চা খাইয়া শ্যামল মুখ তুলিয়া পরিতোষের দিকে চাহিল।

শ্যামল। ওই অসভ্যের মতো আচরণ করতে পারলুম না, তাও আমারই দোষ হলো?

পরিতোষ। ওকে অসভ্যের আচরণ বলে না। ওই রকম ক'রেই মানুষকে জীবন-সংগ্রামে যুঝতে হয়। এবং তাই ক'রে যে জয়ী হয়, বেঁচে থাকবার অধিকার কেবল তারই থাকে, আর সে-ই প্রকৃত পুরুষ! ডারউইন তোমারও পড়া আছে। Struggle for existence যে ধর্ম্ম এবং সেই ধর্ম্মপালনের ফলেই যে হয় Survival of the fittest, এ-ত' তোমার জানা থাকবার কথা।

শ্যামল। কলেজ থেকে বেরিয়েই রেল-আপিসে কাজ করচ; তাই খবর রাখবার অবসরও পাও নি যে, ওই ডারউইনিজম বর্জ্জন ক'রে মানুষ আজ অনেক দূর এগিয়ে এসেচে। মানুষের জ্ঞান আজ বলচে যে, মানুষ মাত্রই বেঁচে থাকবার উপযুক্ত। সে কারণে তাকে সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হয়ে বর্ব্বরতার পরিচয় দিতে হবে না। বাঁচবার অধিকার হচ্চে, মানুষের সহজাত অধিকার। কাজেই অপরাধ তাদের নয়, যারা বাঁচবার জন্ম সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হ'তে অপারক; অপরাধ তাদের যারা সেই অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত রাখে।

পরিতোষ। কে বঞ্চিত রাখচে।

শ্যামল। রাষ্ট্র-সমাজের বর্ত্তমান ব্যবস্থা যারা চালু রেখেচে।

পরিতোষ। দুর্ব্বোধ্য!

শ্যামল। মাসের নির্দ্দিষ্ট তারিখে মাইনে যাদের বরাদ্দ থাকে, কথাটা তাদের পক্ষে বোঝা একটু শক্ত, পরিতোষ।

পরিতোষ। তুমি কম্যুনিজম্ এর দিকে ঝুঁকে পড়চ, শ্যামল।

শ্যামল। নেহাৎই নিরুপায় হয়ে। নতুন কিছু করবার নেশায় মেতে নয়।

[খট্ খট্ শব্দ করিয়া সাহেবী পোষাক পরিয়া কাঞ্চন প্রবেশ করিল।

কাঞ্চন। কন্‌গ্র্যাচুলেট মি পরিতোষ, কন্‌গ্র্যাচুলেট মি শ্যামল।

পরিতোষ। যে হেতু?

কাঞ্চন। যে-হেতু সেই মদের দোকানের লাইসেন্সটা পেয়েচি। বাপ্‌স্, কি চেষ্টাই না করতে হয়েচে।

[টেবিলের বইটইগুলো সরাইয়া রাখিয়া চাপিয়া বসিয়া পা দোলাইতে লাগিল।

তাও কিছু হোত্তোনা, যদি মামাশ্বশুরের জোর না থাকত। ত্থাখ পরিতোষ, এই যে বাপ-মা মেয়ে দেখে ছেলের বিয়ে দেন, আমাদের সমাজের এ ব্যবস্থাটা বড় ভালো। পাশ্চাত্যের অনুকরণে আমরা যে ও-বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা চাই, ও কোন কাজের কথা নয়।

শ্যামল। মদের দোকানের লাইসেন্সে এই জ্ঞানের কথাটি লেখা আছে বোধ হয়।

কাঞ্চন। তা নেই। তবে ওই লাইসেন্স সংগ্রহের ব্যাপারের সঙ্গে এর একটুখানি যোগ আছে। আমি ত, জানই, আমাদের কলেজের সেই রেবাকে বিয়ে করবার জন্যে ঝুঁকে পড়েছিলুম। বাবা বাধা দিয়ে এই মামাশ্বশুরের ভাগ্নীটার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন। রেবাকে যদি বিয়ে করতুম, তাহ'লে এই মামাশ্বশুরটিকেও পেতুম না, আর পেতুম না এই মদের দোকানের লাইসেন্স!

পরিতোষ। এক কাপ চা দোব কাঞ্চন?

কাঞ্চন। নো থ্যাঙ্ক্‌স্! চা আমি খাইনে। তারপর শ্যামল, তোমার কিছু সুবিধে-টুবিধে হোলো।

পরিতোষ। শ্যামল বড় shy। তাই ওর কিছু হচ্ছে না।

কাঞ্চন। কিছু যদি না মনে কর শ্যামল, তাহ'লে আমি বলি, এস, আমার সঙ্গেই ঝুলে পড়। আমার কাছে চাকরি করচ মনে করোনা। ভেব, আমাকে তুমি সাহায্য করচ। যাকে বলে কো-অপারেশন, বুঝলে? দোকানের হিসেব-টিসেবগুলো ঠিক রাখবে, চিঠি-পত্র লিখবে, বুদ্ধি দেবে, পরামর্শ দেবে, আর মাসে মাসে আমার কাছ থেকে গোটাকতক টাকা নেবে—যা নইলে সংসারে টিঁকে থাকা যায় না। game? বল?

[সিগারেট-কেস বাহির করিয়া সিগারেট লইয়া ধরাইল।

পরিতোষ। ওর হয়ে আমিই বল্‌চি কাঞ্চন, ওকে তুমি নাও।

কাঞ্চন। কিন্তু ও হয়ত রাজী নয়। কাজটাকে হয়ত ঘৃণ্য ব'লেই মনে করে।

শ্যামল। না কাঞ্চন, তা আমি করি না। অনেকদিন আগেকার একটি ঘটনার কথা মনে প'ড়ে গেল। তোমাদেরই কথা। তোমার আর ওই পরিতোষের।

কাঞ্চন। এমন কি কথা হে!

শ্যামল। সেবার আমরা সব মিমলেয় মেস করেছিলুম, মনে আছে?

কাঞ্চন। সে ত' এই সেদিনের কথা। আমার যেবার বিয়ে হোলো। তোমরা সব খেলে।

শ্যামল। হাঁ। সেইবার আমাদের গাঁয়ের নিতাই শুঁড়ির ছেলে কলকাতায় এসে থাকবার যায়গা না পেয়ে আমাদের মেসে উঠেছিল। তুমি আর ওই পরিতোষ কিছুতেই তাকে থাকতে দিলে না। এমন সব কথা বল্লে যে, শুনে চোখের জল ফেলতে ফেলতে সে বেরিয়ে গেল। তার অপরাধ, তার ঠাকুর্দ্দা মদ বেচতো। আর আজ তুমি করচ মদের দোকান, আর পরিতোষ দিচ্ছে তাতে উৎসাহ!

কাঞ্চন। তখনকার কথা ছেড়ে দাও ভাই। তখন মদ আর মদ্য-ব্যবসায়ীর ওপর আমার একটা বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। গান্ধীজীও আবার তখন মদ্য-নিবারণকল্পে প্রবল আন্দোলন জুড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটেচে। তখন কাজ করতুম অন্তরের আবেগ তাড়িত হয়ে, আর এখন ইকনমিক ইণ্টার-প্রিটেশান-ই হচ্ছে আমাদের বিচার্য্য। এই বিচারের ফলেই বুঝতে পেরেচি, ব্যবসা, তা মদের হ'লেও, আমাদের হিতসাধনই করবে।

শ্যামল। এম্নি যুক্তি দিয়ে তুমি সব হীন কাজই সমর্থন করতে পার, কাঞ্চন।

[পাশের ঘর হইতে একটা মাতালের গর্জ্জন এবং নারীর কান্নার শব্দ হইল।

শুনচ পরিতোষ, আবার আজ।

[পুনরায় স্ত্রী-কণ্ঠের আর্ত্তনাদ।

কাঞ্চন। ব্যাপার কি হে!

শ্যামল। বিশেষ কিছুই নয়। মদ কিনে যারা তোমাকে বড়লোক ক'রে দেবে, তাদের অনেকেই বাড়ী ফিরে এম্নি উপদ্রব করবে।

কাঞ্চন। মারচে না কি?

শ্যামল। সারারাত এম্নি চলবে।

কাঞ্চন। কি জঘন্য যায়গাতেই তোমরা রয়েচ।

শ্যামল। আমাদের রুচির দোষ দিয়োনা; আমাদের দারিদ্র্যের কথাটা ভেবে দেখো।

কাঞ্চন। ব্যবসা ব্যতীত দারিদ্র্য দূর করতে পারবেনা। তুমি যে শুম হয়ে ব'সে রইলে, পরিতোষ।

পরিতোষ। রোজ রোজ আর সইতে পারি না!

[পুনরায় আর্ত্তনাদ।

শ্যামল। না! রাস্কেলকে আজ রীতিমত শিক্ষা দিয়ে আসতে হোলো।

পরিতোষ। না, না, শ্যামল, তুমি যেয়ো না।

[শ্যামল নিষেধ না শুনিয়া চলিয়া গেল।

কাঞ্চন। শ্যামলটা কি এক্সেন্‌ট্রিক্ হয়ে উঠেচে!

পরিতোষ। চিরদিন ওই রকমই।

কাঞ্চন। কিন্তু কাজ-কর্ম্ম ও কি সত্যিই করবে না?

পরিতোষ। চেষ্টা করে। কিন্তু পায় না।

কাঞ্চন। পাবে কি ক'রে। এইত আমি অফার দিলুম। হাঁ বা না কিছুই বল্লে না। এত দম্ভ ভালো নয়! ফার্ষ্ট ক্লাশ অনার্সের সম্মান এক্জামিনারদের কাছে। সংসারে ঢ়ুকলে বাবা দেখতে পাবে, মুড়ি আর মিছরীর একই দাম।

[হরলালের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে শ্যামল প্রবেশ করিল। হরলাল প্রচণ্ড মাতাল।

শ্যামল। এইখানে চুপটি ক'রে বোসে থাক।

হরলাল। আমার গুরুপুত্তুরের হুকুম...বসতেই হবে। কেনরে শালা? তোর হুকুমে হরলাল মিস্ত্রী এই ঘরে ব'সে থাকবে? কত বড় কারিগর জানিস্?

শ্যামল। মাতলামো করবে তো মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দোব!

হরলাল। না বাবা, মেরোনা, বাবা। একটা পাইট এনে দাও...বাপের সুপুত্তুর হয়ে ব'সে থাকব...বাক্যি আর বার করব না। দাও বাবা গুরুপুত্তুর।

পরিতোষ। ওকে কেন এখানে নিয়ে এলে, শ্যামল?

শ্যামল। এইখানে প'ড়ে থাক্। নেশা কেটে গেলে ছেড়ে দোব।

কাঞ্চন। লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা তোমার ঠিক নয়।

শ্যামল। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা! স্ত্রীকে ধ'রে মারবে তাই!

হরলাল। ইস্তিরী ইস্তিরী করচ কেন গুরুপুত্তুর! কোন্ শালা আমার ইস্ত্রী? ওই সুখী হবে হরা মিস্ত্রীর ইস্ত্রী! মাইরি?

কাঞ্চন। যে কাঁদছিল, সে তোমার স্ত্রী নয়?

হরলাল। হরা মিস্ত্রীর ইস্ত্রী কাঁদবে! সগ্‌গের দেবী সগ্‌গে গেছে। সংসারের জ্বালা সইতে না পেরে সগ্‌গে গেছে। সেখানে গিয়েও সে কাঁদবে? কেন? কাঁদবে হরা মিস্ত্রী! সতী-লক্ষ্মীর শোকে হরা মিস্ত্রী হাঁপুস নয়নে কাঁদবে। কাঁদ, হরা মিস্ত্রী, কাঁদ!

কাঞ্চন। যে কাঁদছিল, সে তোমার কে?

হরলাল। কেন বাবা, অত খবরে তোমার কাজ কি, বাবা? ফুট্‌ফুটে চেহারা, তোমাকে বলি...আর তুমি জমিয়ে তোল, জেঁকে বোস। গুরুপুত্তর পথ খোলসা ক'রে নিয়েচে, পিছু পিছু সবাই যাবে ভেবেচ? কিন্তু কাছেও ঘেঁসতে দোবনা জেনো...কোনো শালাকেও না...ওই শালা গুরুপুত্তুরকেও না। জানলে...!

[উঠিয়া দাড়াইল।

শ্যামল। কোথায় যাও?

হরলাল। গলা কাঠ হয়ে গেছে বাবা, গুরুপুত্তুর। নিঃশ্বেস বন্ধ হয়ে আসচে...আর একটু টানতে হবে বাবা। আমাকে যেতে দাও বাবা গুরুপুত্তুর!

পরিতোষ। শ্যামল ওকে যেতে দাও।

শ্যামল। গিয়েই ত আবার মার-ধর সুরু করবে।

হরলাল। বড্ড যে দরদ গুরুপুত্তুর! তুমি কিন্তু খলিফা আছ বাবা। কী ক'রে জানলে! আমার খাঁচায় যে উড়োল-পাখী, সে খবর তুমি কেমন ক'রে জানলে বাবা?

শ্যামল। ঘুষিয়ে তোমার দাঁত ভেঙে দোব, রাস্কেল। বোস্ এইখানে!

পরিতোষ। বড় বাড়াবাড়ি করচ শ্যামল।

কাঞ্চন। ও যদি ওর বউকে মারেও, তাতে তোমার কি বলবার থাকতে পারে?

হরলাল। বাবা গুরুপুত্তুর, ও মাগী আমার বউ নয়। মাইরি বলচি, বউ নয়! আরে শালা! এমন নেশা কখনো ত হয় না। চোখেও যে দেখতে পাচ্ছিনে, বাবা গুরুপুত্তর। আমার এ কি করলে তুমি!

[শুইয়া পড়িল।

পরিতোষ। তুমি ওকে এ ঘর থেকে বার ক'রে দেবে কি না শ্যামল?

শ্যামল। মাতালের মাতলামো দেখে তুমিও কি মত্ত হয়ে উঠলে, পরিতোষ?

পরিতোষ। সব জিনিষেরই একটা সীমা আছে, তা ভোলো কেন?

শ্যামল। সীমা ত এখনো অতিক্রম করিনি।

পরিতোষ। আমার সহের সীমার কথা বলচি।

শ্যামল। তার মানে?

পরিতোষ। তোমার এই যথেচ্ছাচার আমারও অসহ্য হয়ে উঠেচে।

কাঞ্চন। এ ঘরে কাউকে আনা না-আনা শুধু তোমারই ইচ্ছার উপর নির্ভর করেনা, শ্যামল।

শ্যামল। তাই নাকি পরিতোষ!

পরিতোষ। তাও কি তোমাকে ব'লে বুঝিয়ে দিতে হবে?

শ্যামল। তাহ'লে শোন। এই ঘরের ওপর আমারও অধিকার রয়েচে; আর সেই অধিকারের জোরেই ওকে আমি এখানে রাখব। পার ত বাধা দাও।

পরিতোষ। বাধা দেবার ক্ষমতা থাকলেও ইচ্ছে নেই। তাই বাধা দোবনা। কিন্তু আজই আমি এখান থেকে চ'লে যাব।

শ্যামল। যেতে তুমি অনেকদিন আগেই! কেবল লজ্জায় তা পারছিলেনা।

আজ আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে সেই লজ্জাকেও তুমি জয় করলে। আমার দুঃখও নেই, আফ্‌শোষও নেই! চ'লে যেতে চাইছ, যাও।

পরিতোষ। হ্যাঁ, তাই যাব।

কাঞ্চন। আমার বাড়ীর পাশে একটা ভালো মেস আছে, পরিতোষ। আর মেসেই বা থাকবে কেন? আপিস-ফেরতা আমার দোকানে গিয়ে ঘণ্টা দুই যদি আমার খাতাটাতাগুলো ঠিক ক'রে দাও, তাহ'লে যে আয় তোমার হবে, তাতে তুমি একটা বাসা ক'রেই থাকতে পারবে। তা যাতে পার, আমি দেখব। একসঙ্গে পড়েছিলুম!

হরলাল। বাবা গুরুপুত্তুর, আমাকে ঘরে রেখে এস, বাবা। আমাকে নেশায় পেয়েচে···কিন্তু মদের নয়, মরণের···টেনে নিশ্বেস নিতে পারচিনে ···বুঝলে···গো-হত্যার পাপ হবে গুরুপুত্তুর··ঘরে রেখে এস বাবা। হাঁসপাতালের ডাক্তার বলেছিল, এম্নি ক'রেই একদিন হয়ে যাবে···সেদিন এসেচে, গুরুপুত্তুর!

শ্যামল। চুপ ক'রে শুয়ে থাক্ রাস্কেল!

হরলাল। আর ধমক দিয়ো না গুরুপুত্তুর···যাবার সময় আর ধমক নয় ···এম্নি ক'রেই যে একদিন যেতে হবে, তা জানতুম...কিন্তু যাবার বেলায় আর ধমক নয়। দুটো মিঠে কথা কও···আর পারত একটু চোখের জল ফ্যালো। জান্‌লে গুরুপুত্তুর, এই হরা মিস্ত্রী একজন নামকরা কারিগর···তবুও এর জন্যে কেউ এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলে না। ওই আমার ইস্ত্রী···সগ্‌গে ব'সে··· এলো চুল...মুখে হাসি···আমায় ডাকচে···যাই যাই···জালা জুড়োতে তোমার কাছেই যাই...

[সহসা পড়িয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইল, চোখ নিষ্প্রভ হইয়া গেল।

কাঞ্চন। লোকটা যে মরে, পরিতোষ! হাতে দড়ি পড়বে যে। চল পরিতোষ, আমরা স'রে পড়ি।

পরিতোষ। হাঁ, তাই চল।

[আলনা হইতে জামা লইয়া গায়ে পরিতে লাগিল।

হাতে দড়ি পড়বে, চাকরি যাবে, গুষ্টিশুদ্ধ সব না খেয়ে মরবে।

শ্যামল। তাই যাও পরিতোষ। আমি বলব, আমি ছাড়া ঘরে আর কেউ ছিল না।

[কাল বিলম্ব না করিয়া কাঞ্চন এবং পরিতোষ বাহির হইয়া গেল। শ্যামল ধীরে ধীরে হরলালের পাশে বসিল; ধীরে ধীরে তাহার মাথা তুলিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু দেহের পরশ পাইতেই সরিয়া পিছাইয়া গেল।

মরে গেছে! ওঃ!

[দুই হাতে মুখ ঢাকিল। ধীরে ধীরে একটি প্রৌঢ়া রমণী প্রবেশ করিল। তাহার নাম বামা।

বামা। বেঁচে থাক বাবা। দস্যিটাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেচ। ছুঁড়ীটাকে বাঁচিয়েচ।

শ্যামল। ও ঘুমোয় নি।

বামা। তাই বল। অম্নি মুখ গুঁজে প'ড়ে আছে। উঠতে দিয়ো না, বাবা। এখুনি গিয়ে ছুঁড়ীটাকে পিটুবে। এত ক'রে বলি, কাজ কি একটা দস্যির হাতে প্রাণ দিয়ে। শুনবেনা। কি জানি! ওর মম তো কোন দিন বুঝবু না! মরুক গা। তুমি বাবা, ওকে উঠতে দিয়ো না, যেতে দিয়ো না। [শ্যামল উঠিয়া দাঁড়াইল।

শ্যামল। ও ঘুমোয় নি।

বামা। তা জানি বাবা। অম্নি ক'রে ও প'ড়েও থাকে।

শ্যামল। না, না, তাও নয়...তুমি বুঝতে পারচ না?

বামা। বুঝি বাবা, ও-সব আমি বুঝি। ওকে যেতে দিয়ো না।

শ্যামল। তুমি ওর কে হও?

বামা। সাত জন্মের দাসী। ও মিস্তিরী আর আমি কলুদের বউ ছিনু। হব আর কি! কপাল মন্দ, তাই ওর কাছে দাসীগিরি করি।

শ্যামল। তুমি বুঝতে পারচনা···ও ঘুমোয়নি···ও ম'রে গেছে!

বামা। বল কি গো! ম'রে গেছে কি গো!

শ্যামল। হাঁ, ম'রে গেছে!

রাম। মারতে মারতে তুমিই ওকে মেরে ফেলেচ।

শ্যামল। না, না, আমি ওকে মারিনি···মুখ দিয়ে রক্ত বেরুল···

বামা। ও দিদিমণি গো, খুন করেচে গো, পুলুশ ডাকো গো···

[বলিতে বলিতে বামা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। শ্যামল আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাহিরে একটা কোলাহল উঠিল; দ্রুত যাওয়া আসার শব্দ শোনা গেল। শ্যামল ধীরে ধীরে তাহার তক্তপোষের উপর বসিল। স্থিরদৃষ্টিতে হরলালের দেহের দিকে চাহিয়া রহিল। একে একে বহুলোক ঘরে প্রবেশ করিল। সকলে ভিড় করিয়া হরলালকে দেখিতে লাগিল।

রাম। আর দেখে হবে কি! পুলিশে খবর দাও। লাস তারা নিয়ে যাক।

শ্যাম। আর আসামী যদি ফেরার হয়।

যদু। আমরা নেই!

মধু। ভদ্রলোকের ছেলে, মানুষ খুন করলে?

রাম। মিস্তিরীর টাকার খবর রাখত বোধ হয়।

যদু। টাকার লোভ নয় হে, টাকার লোভ নয়। এর মাঝে কিন্তু রয়েচে।

মধু। সুন্দরী মেয়ে মানুষের লোভে।

শ্যাম। বোঝনা কেন তোমরা। কিন্তু না থাকলে কি এমন হয়?

শ্যামল। তোমরা এখানে কি চাও! বেরিয়ে যাও সব।

যদু। বেরিয়ে যাই, আর তুমি বেমালুম স'রে পড়। কেমন?

শ্যাম। যাব, আগে পুলিস আসুক।

মধু। লাস আর আসামী দুই-ই চালান দিক।

শ্যামল। আমি ওকে কেন খুন করব! তোমরা ভুল করচ। ও ম'রে গেছে। নিশ্চয়ই কোন অসুখ ছিল। ওর বাড়ীর লোকেরা নিশ্চয় জানে। তোমরা দয়া ক'রে বেরিয়ে যাও। আমাকে একটুখানি একা থাকতে দাও, একটুখানি ভাবতে দাও, কি করা যায়। পুলিশে আমিই খবর দোব।

যদু। চুপ কর্ শালা। আর বচন ঝাড়তে হবে না। ভদ্রলোকের ছেলে ব'লে কিছু বলিনি এতক্ষণ। নইলে মেরে বাপের নাম ভুলিয়ে দিতুম। জানিস্?

[শ্যামল লাফাইয়া উঠিয়া তাহাদের দিকে অগ্রসর হইল।

শ্যামল। এতবড় কথা বলতেও তোমার সাহস হয়? বের হও বলচি, বের হও এ ঘর থেকে।

রাম। ওরে, স'রে যা। খুনে। হয়ত ছোরা আছে!

শ্যাম। পিস্তলও থাকতে পারে!

যদু। স'রে আয় সব, স'রে আয়, বোমার বাবুও হ'তে পারে।

মধু। তোদের ভয় হয়, স'রে যা। মানুষ খুন করবে, আবার চোখও রাঙাবে।

[জমাদার ও পাহারাওয়ালা প্রবেশ করিল।

রাম। জমাদার সাহেব, ওকে গ্রেফ্‌তার করো, ও মানুষ খুন করেচে।

[সুখদা দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুখদা। কে বল্লে উনি খুন করেছেন?

[সকলে ফিরিয়া তাহার দিকে চাহিল।

আমাকে যেতে দিন।

[সকলে তাহাকে পথ দিল।

আপনারা এখানে ভিড় করবেন না।

[হরলালের কাছে বসিল। মাথাটা কোলে তুলিয়া লইল। আঁচল দিয়া মুখের রক্ত মুছাইয়া দিল।

এম্নি ক'রেই চ'লে গেলে! দশ বছরের সাথী আমার···যাবার সময় একবার ব'লেও গেলে না!

[ধীরে ধীরে মাথা নত করিয়া হরলালের দেহের উপর লুইয়া পড়িল; তাহার দেহ মাঝে মাঝে কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। সকলে চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িল।
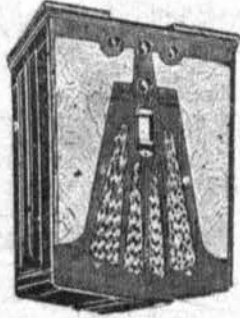
দ্বিতীয় অঙ্ক

শ্যামলের কক্ষ

[এক সপ্তাহ অতীত হইয়া গিয়াছে। শ্যামলের ঘরে বসিয়া সুখদা এক একখানি করিয়া শ্যামলের বই নাড়াচাড়া করিতেছে। দুয়ারটা ভেজানো ছিল। নিঃশব্দে দুয়ার ঠেলিয়া শ্যামল প্রবেশ করিল। রুক্ষ চুল। কামাইতে পারে নাই বলিয়া দাড়ী-গোঁফ গজাইয়া বেশ বড় হইয়াছে। সুখদাকে দেখিয়া শ্যামল বিস্ময় প্রকাশ করিল।]

শ্যামল। আপনি! এখানে?

সুখদা। রোজ দুপুরে এই ঘরেই থাকি। আপনি আসুন। জামাটা খুলে ফেলুন। শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর চান ক'রে নিয়ে সুস্থ হোন। কথাবার্ত্তা পরে হবে। আপনি একটু বসুন, আমি আসচি।

[সুখদা চলিয়া গেল। শ্যামল চাহিয়া চাহিয়া তাহাকে দেখিল। তারপর সে দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেলে টেবিলের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুখদা প্রবেশ করিল। হাতে তাহার রেকাবী এবং একগ্লাস জল।

ওকি! এখনও দাঁড়িয়ে রয়েচেন যে? এই মিষ্টিটুকু মুখে দিয়ে জল খেয়ে নিন্।

শ্যামল। আমার ত এখন খিদে নেই।

সুখদা। তা জানি। এমন অবস্থায় মানুষের খিদে থাকেনা। কিন্তু আপনাকে খেতেই হবে।

[টেবিলের ওপর গ্লাস ও রেকাবী রাখিল।

শ্যামল। আচ্ছা, খাব এখন। একটু পরে।

সুখদা। আমি জান্তুম, আপনি আজ আসবেন।

শ্যামল। জান্তেন!

সুখদা। দেখুন না বিছানা ঝেড়ে পেতে রেখেচি, কুঁজোয় জল রেখেচি, আপনার জিনিষ-পত্তর সব গুছিয়ে রেখেচি। যা ক'রে রেখেছিলেন।

শ্যামল। আপনি জান্তেন আমি আজ আসব। অথচ আমি জান্তুম না।

সুখদা। আপনি ছিলেন ফাটকে আটক, আপনার ত জানবার কথা নয়। আমি তদ্বির করতুম। তাই ঠিক সময়ে খবরও পেয়েছিলুম।

শ্যামল। আপনি তদ্বির করতেন! কেন?

সুখদা। করব না! আমারই জন্যে আপনাকে এই বিপদে পড়তে হয়েছিল যে!

শ্যামল। মিস্ত্রী আপনার স্বামী ছিলেন না?

সুখদা। না। [মাথা নত করিল।

শ্যামল। ও! [শ্যামল অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। সুখদা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল।

সুখদা। আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না?

শ্যামল। না।

সুখদা। সময় মতো আমিই একদিন সব বলবো।

শ্যামল। জানবার আগ্রহ নেই।

সুখদা। কর্ত্তব্যবোধ থাকতে পারে।

শ্যামল। আপনার সম্বন্ধে আমার কোন কর্ত্তব্যইও নেই।

সুখদা। তখনো ছিলনা, যখন সেই মাতাল আমাকে পীড়ন করত। তবুও সেই পীড়ন থেকে বাঁচাবার জন্যে আপনি নিজেই গিয়েছিলেন। হয়ত কর্ত্তব্যবোধের জন্যেই।

শ্যামল। অত ভেবে দেখি নি।

সুখদা। আপনার বন্ধুও ভাবতেন না। কিন্তু তিনি যাননি, আপনি গিয়েচেন।

শ্যামল। আপনি কে ?

সুখদা। আপনার আগ্রহ নেই, কিন্তু তবুও জানতে চাইছেন। দেখুন, আমার দোষ নেই।

শ্যামল। আপনি আমাকে বিস্মিত ক'রে তুলেচেন।

সুখদা। মিষ্টি কিন্তু এখনও মুখে দেন নি! আমার ছোঁয়া হয়ত খাবেন না ?

শ্যামল। কেন ?

সুখদা। আমি মিস্ত্রীর স্ত্রী নই ব'লে।

শ্যামল। আমি সংসারের কাউকে ঘৃণা করিনা।

সুখদা। কেবল ঘৃণা করেন মাতালকে! তাও আবার বিশেষ ক'রে যখন সে তার স্ত্রীকে ধ'রে মারে। কেমন ?

শ্যামল। আমার বন্ধুটি কবে চ'লে গেলেন।

সুখদা। দিন পাঁচেক হোলো এসে জিনিষ-পত্তর নিয়ে গেছেন। ভাড়াও চুকিয়ে দিয়ে গেছেন। আপনার খোঁজ-খবর কিছু রাখেন কিনা জানতে চাইলুম। জবাব দিলেন, সময় নেই।

শ্যামল। একটি উকিল একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, আমার এক বন্ধু তাঁকে পাঠিয়েচেন।

সুখদা। আপনার আরো বন্ধু আছে।

শ্যামল। খুনী-আসামীকে বন্ধু ব'লে স্বীকার করবে, এমন তো কাউকে মনে পড়চে না।

সুখদা। আপনার মতো যাঁরা পরোপকার ক'রে বেড়ান, তাঁদের অনেক অজানা বন্ধু থাকতে পারে।

শ্যামল। কি ক'রে যে মুক্তি পেলুম, তা বুঝতে পারচিনে। আমি যে খুন করিনি, তা কোন মতেই আমি প্রমাণ করতে পারতুম না।

সুখদা। কিন্তু ডাক্তারি পরীক্ষায় যে প্রকাশ পেল, খুনই আদৌ হয়নি। আরো প্রমাণ আমার কাছে ছিল। বছরে দু-তিনবার ডাক্তাররা ওকে সাবধান ক'রে দিতেন যে, ওই ভাবেই ওর একদিন হবে মৃত্যু।

শ্যামল। আপনি আমাকে বাঁচালেন!

সুখদা। কেন বলুন ত!

শ্যামল। কি জানি, আমার কেমন যেন মাঝে মাঝে মনে হোতো, ওর মৃত্যুর জন্যে সত্যিই আমি দায়ী। তাই মুক্তি যখন পেলুম, তখনো স্বস্তি পেলুম না মনে।

সুখদা। মুক্তি যদি না পেতেন ?

শ্যামল। খুব বেশী দুঃখ হোত না।

সুখদা। বিনা অপরাধে শাস্তি হোতো ব'লেও নয় ?

শ্যামল। শাস্তি পীড়াদায়ক হয় তখন, যখন সুখের ঘটে অভাব। জীবনেই যার সুখ নেই, শাস্তি তাকে বেশী কি পীড়া দেবে ?

সুখদা। আপনার বয়েস ত বেশী নয়।

শ্যামল। আপনারও খুব বেশী ব'লে মনে হচ্ছে না।

সুখদা। তা হ'লেও আপনার চেয়ে অনেক বড় মনে রাখবেন।

শ্যামল। তাও হয়ত প্রমাণসাপেক্ষ!

সুখদা। সে প্রমাণও একদিন পাবেন।

শ্যামল। কিন্তু আমাকে যে আজই চ'লে যেতে হবে।

সুখদা। কোথায় ?

শ্যামল। এর চেয়েও একটা কম ভাড়ার ঘর-টর দেখে উঠে যেতে হবে। এ ভাড়া দেবার শক্তি আমার নেই।

সুখদা। এ মাসের ভাড়া আপনার বন্ধু দিয়ে গেছেন। কাজেই আজ না গেলেও আপনার চল্‌বে। কিন্তু এখনো আপনি মিষ্টি মুখে দিলেন না! বেলা বেড়ে যাচ্ছে। কখন নাইবেন, খাবেন ?

শ্যামল। এ-বেলা আর কিছুই খাবনা।

সুখদা। কিন্তু আমিও যে না-খেয়ে রয়েচি!

শ্যামল। কেন ?

সুখদা। বাঃ, আপনাকে না খাইয়ে কেমন ক'রে খাই ? মেয়েমানুষ ত' আমি।

শ্যামল। অপরিচিত একটা লোকের জন্যে আপনার এই দরদ—

সুখদা। যদি বলি, অপরিচিতদের নিয়েই যে আমাকে ঘর করতে হয়।

[শ্যামল কোন জবাব দিল না। সুখদাও দ্রুত বাহির হইয়া গেল। শ্যামল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর গায়ের জামাটা খুলিয়া ফেলিল। কুঁজো হইতে জল গড়াইয়া দাড়ী কামাইবার আয়োজন করিতে লাগিল। সুখদা প্রবেশ করিল।

ভাত হয়ে গেছে। আপনাকে নামিয়ে নিতে হবে। আমি ত ছোঁব না।

শ্যামল। কেন ?

সুখদা। আপনি খাবেন ব'লে।

শ্যামল। যদি খেতে হয়, তাহ'লে আপনি ছুঁয়েচেন ব'লে বাধবে না।

সুখদা। কিন্তু আমার যে বাধে।

শ্যামল। আপনি কি এখনও এই বাড়ীতে থাকবেন ?

সুখদা। এ যে আমারই বাড়ী।

শ্যামল। আপনার বাড়ী!

সুখদা। হ্যাঁ, নিজের টাকায় তৈরী!

শ্যামল। আপনি তাহ'লে টাকার জন্যে···

সুখদা। থামলেন কেন ? বলুন, টাকার জন্যে ?

শ্যামল। সেই মিস্ত্রীর···পীড়ন সইতেন না ?

সুখদা। তাকে যে আমি ভালোবাসতুম!

শ্যামল। সেই মিস্ত্রীকে ?

সুখদা। হ্যাঁ, সেই মিস্ত্রীকে! তিন বছর আগে তার রূপ ছিল অন্য—যেমন চেহারায়, তেম্নি চরিত্রে।

শ্যামল। সেই মিস্ত্রীর ?

সুখদা। হ্যাঁ। শুনে বিস্মিত হবেন যে, সে বেশ ভালো ঘরেরই ছেলে, এবং লেখাপড়াও জানত।

শ্যামল। হরলাল মিস্ত্রী!

সুখদা। সংসারের উপর তার এমন বিরক্তিই হয়েছিল যে, বাপ-মায়ের দেওয়া নামটাও সে নিজের ক'রে রাখতে পারেনি।

শ্যামল। আশ্চর্য্য!

সুখদা। আপনার বয়েস অল্প, তাই আশ্চর্য্য ব'লে মনে হচ্ছে।

শ্যামল। কিছুতেই বিস্মিত না হবার বয়েস কি আপনারই চ'লে গেছে ?

সুখদা। না গেলেও এই বয়েসেই এত রকমের মানুষ দেখবার, জানবার, চেনবার সুযোগ পেয়েচি যে, মানুষের ভাগ্য-পরিবর্ত্তন দেখে ব্যথাও পাই না, বিস্মিতও হই না !

শ্যামল। মিস্ত্রীর কাজ করত কেন ?

সুখদা। মর্য্যাদাবোধ খুবই বেশী ছিল ব'লে। ও কাজ তাকে প্রথম প্রথম আমি করতে দিতে চাইনি। কিন্তু শেষে বাধা দেওয়াকে পাপ ব'লে মনে হয়েচে।

শ্যামল। লেখাপড়া জানত, ভালো কাজকর্ম্মও ত করতে পারত।

সুখদা। পারত কিনা জানিনা। কিন্তু সে তার সমাজ থেকে দূরে লুকিয়ে থাকতে চাইত। তাই সে বলত, আফিসে নয়, কারখানার কুলিদের মাঝেই তার স্থান।

শ্যামল। চরিত্র যার এতটা সুস্থ ও সবল, সে মদ খেতো কেন ?

সুখদা। সে বলত, দিবারাত্র তার অন্তরে যে আগুন জলে, তার জ্বালা ভোলাতে পারে কেবল ওই মদ। আর মৃত্যুও হোলো, ওই মদেরই জন্যে।

শ্যামল। আপনি বাধা দিতেন না ?

সুখদা। দিতে চাইতুম ব'লেইত মার খেতুম, কাঁদতুমও—যা শুনে আপনি চঞ্চল হয়ে উঠতেন।

শ্যামল। আপনাদের প্রেম অসাধারণ।

সুখদা। জীবনও অসাধারণ কিনা !

শ্যামল। হরলাল মিস্ত্রীর ওপর আজ আমার শ্রদ্ধা হচ্ছে।

সুখদা। বেঁচে থাকতে যদি তা হোতো, তাহ'লে আপনার আর তার দু'জনেরই ভালো হোতো।

শ্যামল। তখন যে তাকে বুঝিনি।

সুখদা। সংসারে হয়ত মানুষ এই অভিশাপ নিয়েই আসে। কিছুতেই মানুষকে বুঝতে চায় না, পারেও না।

শ্যামল। আপনার এ-কথা সত্যি। আমি দেখেচি, আমাকে এত লোকে এমন ভুল বোঝে !

সুখদা। আপনার সঙ্গে মিস্ত্রীর অনেক বিষয়ে মিল আছে।

[শ্যামল চমকাইয়া সুখদার দিকে চাহিল।

ভয় নেই। তার আর আপনার এক পরিণতি হবে না। অন্তত আমি তা হ'তে দোব না।

শ্যামল। নিজেকে বশ করবার শক্তি এখনো আমার আছে।

সুখদা। তারই কি কম ছিল ! সংসারের সব আকর্ষণ অগ্রাহ্য করবার মতো শক্তি ক'জন লোকের থাকে ? তার তা ছিল। নিন, এইবার চলুন, নাইবেন চলুন।

শ্যামল। আমি নীচে থেকেই নেয়ে আসচি।

[শ্যামল কাপড় আর গামছা লইয়া বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল।

সুখদা। এই বারান্দার শেষেই আমাদের নাইবার ঘর। সেইখানেই যান। তেল, সাবান সব রয়েচে।

[শ্যামল কিছু না বলিয়া দুয়ারের দিকে গেল।

নীচে আর যাবেন না। কত লোক রয়েচে, কত কথা জান্তে চাইবে। আমার ওদিকে জনপ্রাণী নেই।

[শ্যামল একটু দাঁড়াইয়া কি ভাবিল। তাহার পর চলিয়া গেল। সুখদা দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল। তারপর ফিরিয়া আসিয়া পরিতোষ-পরিত্যক্ত তক্তপোষখানির উপর গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল। বামা প্রবেশ করিল।

বামা। তুমি এই ঘরে ! আমি ছিষ্টি খুঁজে এনু। এই ছেলেটি বুঝি ছাড়ান পেয়েচে ?

সুখদা। হুঁ।

বামা। খাসা ছেলে। যেমন ফুটফুটে চেহারা, তেমনি চরিত্তির। আমি কত বন্নু, শুন ও করেনি।

সুখদা। তুমিইত চেঁচামেচি ক'রে এই কাণ্ডটা বাধালে। ভদ্রলোক আমাদের উপকার করতে গিয়ে এই বিপদে পড়ল। ওর বন্ধুটিও চ'লে গেল। আজ বেচারা একেবারে একা।

বামা। সেই রক্তও দেখনু, আর আমার মাথার মাঝেও চন্ চন্ ক'রে উঠল। তারপর কি যে বন্নু, কি যে কন্নু, কিছু কি আমার মনে আছে গো ! ওরে বাপরে ! কি সে রক্ত ! ঠিক এই জায়গায়···যাকে বলে রক্ত সমুদ্দুর গো !

সুখদা। ও কথা থাক বামা-দি।

বামা। তাই থাক। ছেলেটি কোথায় গেল ?

সুখদা। নাইতে।

বামা। আহা ! নেয়েখেয়ে সুস্থ হোক্। তা মতিগতি কেমন দেখলে, দিদিমণি ?

সুখদা। বেশ ভালো লোক।

বামা। তা আর হবে না। তোমার কান্না শুনলে অস্থির হয়ে উঠ্তো ! ছেলে মানুষ। বাচ্চাই বলা যায়।

সুখদা। তুমি হাসালে বামা-দি। এতই কি ছেলেমানুষ !

বামা। না, এই তোমারই সমান হবে।

সুখদা। আমার চেয়ে ছোট।

বামা। তা যদি বল্লে দিদিমণি, তাহ'লে শোন। তোমার এই বামা-দির যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, সে-ও ছিল আমার চেয়ে বয়েসে ছোট। আমার মাসতুতো বোনের বিয়েতে গেছনু। সেই মুখপোড়াও এসেছিল গো ! কুটুম্ব। সেদিন বাদলাও ছিল খুব। বারান্দায় ব'সে গরম গরম মুড়ি খাচ্ছিনু, ছেলেপুলেরা সব। সেই সময় মুখপোড়া করলে কি জান ? চুপি চুপি আমাকে বল্লে, এই বামী, আমাকে বিয়ে করবি ? আমি বন্নু দূর, তুই যে আমার চেয়ে বয়েসে ছোট ! সে বল্লে, তা হোক্ ! মাকে ব'লে দিনু। মা বল্লে, বড় গেরস্তর ছেলে বিয়ে করতে চায়, তোর ভাগ্যি। জান, দিদিমণি, সেই থেকে আমার বয়েস তিন বছর ক'মে গেল। তার বয়েস কম ব'লেও বাধল না, বিয়ে তার সাথেই হোলো।

সুখদা। আমার বাদে বামা-দি !

বামা। তোমাকে ত আর বিয়ে করতে বলচি না।

সুখদা। তুমি বলচ না ব'লেইত পারচি না, বামা-দি !

বামা। দিদিমনির যে কথা ! [শ্যামল প্রবেশ করিল।

সুখদা। ভিজে কাপড়খানা বুঝি রেখে আসতে পারলেন না।

[শ্যামল কাপড়খানা পরিতোষের তক্তপোষের উপর ফেলিয়া রাখিল।

এই নিন।

[আয়না চিরুণী আগাইয়া দিল।

বামা। মন্দ মানায় না।

সুখদা। এখন বোকোনা, বামা-দি!

বামা। না, দিদিমণি, বলছিনু, সেই আর এই। আকাশ পাতাল তফাৎ।

[শ্যামল আয়না চিরুণী রাখিয়া দিল।

সুখদা। এইবার মিষ্টিটা মুখে দিয়ে আসুন আমার সঙ্গে।

[রেকাবী হাতে তুলিয়া দিল। শ্যামল কোন কথা না বলিয়া একটা মিষ্টি মুখে দিয়া রেকাবীখানা রাখিয়া দিয়া জল খাইয়া গ্লাসটিও রাখিয়া দিল।

বামা-দি, তুমি বিছানাটা ঝেড়ে পরিষ্কার ক'রে রেখে দাও। আসুন।

শ্যামল। চলুন। আপনিও না খেয়ে রয়েচেন।

সুখদা। সবাই খায় নিজের খিদের তাগিদে, আপনি খাচ্ছেন পরের তাগিদে।

শ্যামল। নিজে যেন আমি ক্ষুধা তৃষ্ণা জয় ক'রেই ব'সে আছি।

সুখদা। পরিচয় ক্রমেই পাওয়া যাবে। চলুন।

[যাইবার সময় শ্যামলের ভিজে কাপড়খানা লইয়া গেল। বামা দেখিল তাহারা কত দূর গিয়াছে। তারপর আপন মনেই কহিল।

বামা। ছুঁড়ীটা গায়ে প'ড়ে আলাপ জমিয়ে তুলতে ওস্তাদ। কিন্তু কপাল ওর মন্দ। এত ক'রেও কারু মন পায়না। ছোটলোক মিস্ত্রী, সে-ও ওকে ভালোবাসত না। আর হবেনা কেন, যেমন রুচি!

[বামা বিছানা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। শ্যামল প্রবেশ করিল।

বামা। এরই মধ্যে খাওয়া হয়ে গেল?

শ্যামল। হ্যাঁ। আমি একটু একা থাকতে চাই।

[বামা প্রস্থান করিল।

না। আর এক বেলাও এখানে থাকা হবেনা। কিন্তু কি ক'রেই বা যাই? আর কোথায় গিয়েই বা উঠি।

[খানিকটা পায়চারী করিয়া টেবিলে ভর দিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু যেতেই হবে, উপায় নেই।

[উঠিয়া তক্তপোষের তলা হইতে একটা ট্রাঙ্ক বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল। বিছানার তলা হইতে চাবি বাহির করিয়া বাক্স খুলিল।

একি! এতগুলো নোট এলো কোত্থেকে?

[একতাড়া নোট বাহির করিয়া গণিতে লাগিল। পরে চিন্তাকুল হইয়া পড়িল। দ্রুতপদে সুখদা প্রবেশ করিল।

সুখদা। খেতে বসিয়ে তাড়াতাড়ি চানটা সেরে নিতে গেছি, আর অমনি উঠে এসেছেন?

[শ্যামলের হাতে নোটের গোছা দেখিয়াও দেখিল না।

শ্যামল। আপনি বলতে পারেন, এ-টাকা আমার বাক্সে কেমন ক'রে এল?

সুখদা। অপরের বাক্স খোলবার অভ্যেস আমার নেই।

শ্যামল। না, সে-কথা আমি বলচিনে। আমার সেই বন্ধুটি কি রেখে গেছেন?

সুখদা। বন্ধুর জন্যে রেখে যেতেও পারেন।

শ্যামল। কিন্তু পঞ্চাশ টাকা সে পাবে কোথায়? এ যে তার একমাসের মাইনে। সবই দেশে পাঠাতে হয়। এ টাকা সে রাখতে পারেনা। বড় বিপদে পড়লুম তো!

সুখদা। এমন আর কি বিপদ! আপনার বাক্সে পেয়েচেন, আপনি খরচ ক'রে ফেলুন। তারপরও যদি আবার বাক্সে টাকা পান, তাহ'লে ভাববেন আলাদীনের প্রদীপের মতো আপনিও এক আশ্চর্য্য বস্তু পেয়েছেন।

শ্যামল। আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপ! হাঁ, সেই প্রদীপের শিখাটি আমি দেখতে পেয়েচি।

সুখদা। কোথায়?

শ্যামল। এই যে আমার সামনে। টাকা আপনিই রেখেচেন। দয়া ক'রে মিথ্যে বলবেন না। বলুন।

সুখদা। কিন্তু হঠাৎ ট্রাঙ্ক খোলবার দরকারটা কি হলো শুনি?

শ্যামল। বইগুলো বাক্সে পুরে ফেলব ভেবেছিলুম। ফেলে যেতে পারবনা।

সুখদা। ও, তাহ'লে যাবার আয়োজন হচ্ছে বলুন।

শ্যামল। হাঁ, যাওয়াই ভালো।

সুখদা। গায়ে প'ড়ে আমি যদি আলাপ জমিয়ে তুলতে না চাইতুম, তাহ'লে হয়ত পালাবার জন্যে এমন অস্থির হয়ে উঠতেন না। না?

শ্যামল। আপনার দয়ার কথা চিরকাল আমার মনে থাকবে। আপনার এই টাকা থেকে দশটা টাকা আমি নিচ্ছি। দিনকতক বাদে একদিন এসে দিয়ে যাব।

সুখদা। তাই দেবেন।

শ্যামল। বাকীটা আপনি রেখে দিন।

সুখদা। দিন।

[হাত বাড়াইয়া দিল। শ্যামল বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিল। তারপর নীরবে নোট ক'খানা তাহার হাতে দিল। সুখদা নোট ক'খানা কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

শ্যামল। ও কি করলেন!

সুখদা। আমরা যা দান করি, তা আর ফিরিয়ে নিইনা।

শ্যামল। কিন্তু দানের কাজে দাতার খেয়ালটুকুই সব নয়—দান গ্রহণ করবার সম্মতিই হচ্ছে আসল কথা। সেই সম্মতির অপেক্ষা না রেখে দানের প্রবৃত্তি একদিকে যেমন দাতার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করে, অন্য দিকেও তেমি ঘোষণা করে গ্রহীতার অপমান।

সুখদা। আপনার বাক্সে টাকা রেখে আমি আপনার সেই অপমানই করিচি?

শ্যামল। নোটগুলো যদি ছিঁড়ে না ফেলতেন, তাহ'লে আর অপমান করা হোতনা—ছিঁড়ে ফেলেই অপমান করলেন। আর সেই কারণে এ দশ টাকাও আপনার কাছ থেকে আমি ধার নিতে পারিনা।

সুখদা। বেশ দিন আমাকে!

শ্যামল। ছিঁড়ে ফেলবেন তো?

সুখদা। দিন না আমাকে!

[শ্যামল সে নোটখানিও দিল। সুখদা গলায় আঁচল দিয়া প্রণত হইল, নোটখানা পায়ের কাছে রাখিয়া কহিল।

আমার অতিথি হয়ে, আমার বাড়ী অন্নগ্রহণ ক'রে আমাকে ধন্য করেছেন। ভোজন-দক্ষিণারূপে এই টাকা ক'টি গ্রহণ ক'রে আমার পুণ্যলাভের সহায়তা করুন।

শ্যামল। আপনি কে? কি আপনি? আপনার এ অবস্থাই বা কেন!

সুখদা। সবই বলব বলেছিলুম। কিন্তু আপনি ত থাকতে পারলেন না। দক্ষিণাটা তুলে নিন।

[শ্যামল তাহাই করিল। তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

হরলাল মিস্ত্রী আপনার চেয়ে ঢের বেশি শক্তিমান ছিল।

[শ্যামল কোন কথা কহিল না।

আপনার হয়ত একটা মুটের দরকার হবে। বামা-দিকে বলচি একটা পাঠিয়ে দিতে। আর যদি আপনার পৌরুষে না বাধে, তাহ'লে যাবার সময় খবর দেবেন। আর একবার দেখা করব।

[সুখদা চলিয়া গেল। শ্যামল দাঁড়াইয়া রহিল। কোন কথা কহিল না। পরক্ষণেই সুখদা ফিরিয়া আসিল।

আর একটা কথা আপনাকে বলা দরকার মনে করচি। আপনার সঙ্গে আত্মীয়তা করবার যে চেষ্টা করলুম,তার কারণ হয়ত আপনি বুঝতে পারচেন না। হয়ত মনে করচেন, হরলাল মিস্ত্রীকে যে জালে আমি জড়িয়ে রেখেছিলুম, আপনাকে জড়িয়ে রাখবার জন্যেও সেই জালই ফেল্‌চি। জেনে যান যে, তা সত্য নয়।

শ্যামল। আপনি হরলাল মিস্ত্রীর সঙ্গে আমার তুলনা করবেন না।

সুখদা। না, তা আর করব না। কেন-না সে ছিল শক্তিমান পুরুষ, আর আপনি একগুঁয়ে বালক। মেয়েমানুষ সম্বন্ধে আপনার কোন অভিজ্ঞতাই নেই—অন্ততঃ আমাদের মতো মেয়েমানুষ সম্বন্ধে ত নয়ই। হরলাল মিস্ত্রীর যায়গায় বাহাল করবার জন্যে আমি আপনাকে আপন করতে চাই নি। তার প্রয়োজন হ'লে, যোগ্যতর লোকের অভাব হবে না। আপনাকে আমি দিতে চেয়েছিলুম স্নেহ; যে স্নেহ মায়ের বুকে থাকে, বোনের অন্তরে থাকে। অবশ্য দিতে চেয়েছিলুম আপনার প্রয়োজনে নয়, আমারই প্রয়োজনে। পাত্রের অভাবে এতদিন আমি সে-স্নেহ অন্তরে সঞ্চিত রেখেছিলুম। আপনি আমার অন্তর স্পর্শ করেছিলেন, তাই স্নেহ পাবার অধিকারীও হয়েছিলেন। কিন্তু দিতে যখন চাইলুম, তখন আপনি করলেন আঘাত। আঘাত করলেন আপনার সন্দেহ দিয়ে—ইতর লোকে এমনি সন্দেহ করতে পারে; কিন্তু আপনার করা ঠিক হয়নি!

[সুখদা অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল। শ্যামল কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। তারপর বইগুলি ট্রাঙ্কে ভরিতে লাগিল। বামা প্রবেশ করিল।

বামা। এই নাও বাছা তোমার ধুতি।

[বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। ট্রাঙ্ক বন্ধ করিয়া শ্যামল সোজা হইয়া দাঁড়াইল। একজন লোক দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার নাম—রাম।

রাম। নমস্কার মশাই, শুনলুম আপনি চ'লে যাচ্ছেন।

শ্যামল। হ্যাঁ, চ'লেই যাচ্ছি।

রাম। আমি আপনার বিছানাপত্তর বেঁধে দোব?

শ্যামল। না, আমিই পারব।

রাম। যাচ্ছেন, ভালোই করচেন, মেয়েমানুষটি বড় সুবিধের নয়।

[শ্যামল চকিতে মুখ ঘুরাইয়া তাহার দিকে চাহিল।

শ্যামল। কোন মেয়েমানুষের কথা আপনার মুখে আমি শুনতে চাইনে।

রাম। আজ্ঞে, আপনি ভদ্দরলোক!

[শ্যামল কাজ শেষ করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল।

শ্যামল। আমাকে একটা মুটে ডেকে দেবেন?

রাম। তা দোবনা! আমি যাচ্ছি। নমস্কার মশাই।

শ্যামল। নমস্কার!

[শ্যামল চারিদিক চাহিয়া দেখিল। তারপর একবার দুয়ারের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। আবার ফিরিয়া আসিয়া তক্তপোষের উপর গালে হাত দিয়া বসিল। একটি ঝাঁকা-মুটে প্রবেশ করিল।

মুটে। মোটিয়া আছে, বাবু।

শ্যামল। আও, এধার আও। এই বিছানা ঔর বাকস্ লেনে হোগা।

মুটে। কাঁহা বাবু?

[শ্যামল চুপ করিয়া রহিল।

বোলিয়ে বাবু, কাঁহা জানে পড়েগা?

শ্যামল। পিছাড়ী বোলেগা।

[মুটিয়া বিছানা আর বাক্স ঝাঁকায় রাখিল। মাথার পাগড়ীটা বাধিল।

মুটে। ধরিয়ে বাবু।

[শ্যামল দাঁড়াইয়া রহিল।

আইয়ে বাবু।

শ্যামল। দেখো মুটিয়া, ওই বারান্দামে যাকর বাঁ হাত যাও। উধার মাইজী হায়। উনকী বোলো, বাবু আভ্‌ যাতা হায়।

[সুখদা প্রবেশ করিল।

সুখদা। আমি নিজেই এসেচি।

শ্যামল। এগুলো আর নিয়ে যেতে পারলুম না।

সুখদা। যখন সুবিধে হবে, এসে নিয়ে যাবেন।

শ্যামল। আপনার দান গ্রহণ করতে পারলে অনেকটা বাঁচতুম।

সুখদা। গ্রহণ করতে কেন পারলেন না?

শ্যামল। ঠিক বলতে পারি না

সুখদা। আমি বলব?

শ্যামল। বলুন ত!

সুখদা। দুর্ব্বল ব'লে।

শ্যামল। দুর্ব্বল লোকেরাই ত দানের দৌলতে বেঁচে থাকতে চায়।

সুখদা। আমি যদি গেরস্ত হতুম, তাহ'লে আপনিও তা চাইতেন। কিন্তু আমার দান নিতে আপনার ভয় হচ্ছে। আপনার বিশ্বাস রয়েচে, পতিতা পুরুষকে পাতিত করে।

শ্যামল। তা কি করেনা?

সুখদা। যাদের নিয়ে খেলা করতে চায়, তাদের করে। স্নেহ যাদের দিতে চায়, তাদের নয়। কামনাই নারীর অন্তরের সবখানি যায়গা জুড়ে থাকেনা, স্নেহ মমতার স্থানও তাতে আছে। তাই নারী শুধুই কামিনী নয়; সে মা, সে বোন, সে বন্ধু। নিজে দুর্ব্বল ব'লে এ-কথা আপনিও বুঝলেন না, এই আমার দুঃখ।

শ্যামল। এই! চলো আভি্‌।

[শ্যামল দ্রুত অগ্রসর হইয়া ঝাঁকা তুলিতে মুটেকে সাহায্য করিল। মুটে অগ্রসর হইল। শ্যামল করযোড়ে নমস্কার জানাইয়া কহিল।

চললুম, তবে।

[সুখদা কোন কথা কহিল না।

আপনার দান আমি গ্রহণ করলুম।

[সুখদার দু'চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

ভাগ্য-বিতাড়িতের জীবনে আপনার এই দান পরম সম্পদরূপে চিরদিনের জন্যে জমা হয়ে রইল।

[উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া শ্যামল বাহির হইয়া গেল। সুখদা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বামা প্রবেশ করিল।

বামা। সত্যিই চ'লে গেল, দিদিমণি?

সুখদা। হাঁ, বামা-দি চ'লেই গেল!

[দুজনেই চুপ করিয়া রহিল।

বামা-দি, দরজায় একটা তালা লাগিয়ে দিতে হবে। এ-ঘর এখন আমরা কাউকে ভাড়া দোব না।

[বামা কোন কথা কহিল না। যবনিকা পড়িল।

তৃতীয় অঙ্ক

[অন্য অঞ্চলের আর একখানি ঘর। ছোট, অপরিচ্ছন্ন। অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। ঘরে কেহ নাই। বন্ধ দুয়ারের তালা খুলিয়া শ্যামল ঢুকিল; হাতে তাহার একটা মোমবাতি। পকেট হইতে দিয়াশালাই বাহির করিয়া বাতিটা জ্বালাইয়া টেবিলের ওপর রাখিল। গুম খাইয়া বসিয়া রহিল। তাহার চেহারা শুকাইয়া গিয়াছে, কামায় নাই বলিয়া দাড়ী-গোঁফ বড় হইয়া উঠিয়াছে। জামাটার যায়গায় যায়গায় কালি লাগিয়াছে। বয়েস যেন দশবছর বাড়িয়া গিয়াছে। পরেশ প্রবেশ করিল।]

পরেশ। শ্যামবাবু ঘরে আছেন?

শ্যামল। হাঁ, আসুন।

পরেশ। কখন ফিরলেন কারখানা থেকে?

শ্যামল। এই ত ফিরছি।

পরেশ। বলেছিলুম, এ-কাজ আপনি পাবেন।

শ্যামল। আপনার দয়া।

পরেশ। ছোটলোকের কাজ। তা ক্ষেতি কি বলুন। কুড়ি টাকা মাইনে। কুড়ি টাকায় কত বি-এ পাশ পাওয়া যায়। কি বলুন!

শ্যামল। আমি একটি বি-এ পাশ-করা লোককে জানতুম পরেশবাবু, যে তিন বছর চেষ্টা ক'রেও কুড়ি টাকার একটা চাকরি যোগাড় করতে পারেনি।

পরেশ। পুঁথির বিদ্যেয় আর কত হবে, বলুন। আপনি পাশ-টাস দেন নি, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি পড়বার সখ আছে।

[পরেশ একখানা বই তুলিয়া লইল।

শ্যামল। এক সময়ে ছিল, এখন আর নেই।

পরেশ। পড়তে আমিও একটু আধটু পারি।

[মলাট উল্টাইয়া।

সিয়ামল ব্যানার্জী। মাড়োয়ারীর বই বুঝি! S-Y-A-M-A-L সিয়ামলই ত।

শ্যামল। নামটা শ্যামল, লোকটা বাঙালী, আমার বন্ধু।

পরেশ। বন্ধু! বেশত! শ্যাম আর শ্যামল। বেশ মিল আছে। আপনাতে আর আপনার বন্ধুতেও বোধ হয় এমিতর মিল!

শ্যামল। হাঁ, একেবারে অভিন্ন।

পরেশ। হ'তেই হবে, শ্যামবাবু, হ'তেই হবে।

[শ্যামল উঠিয়া একবার ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইল।

আপনাকে আজ বড় আনমনা দেখতে পাচ্ছি।

[শ্যামল তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল। তারপর একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া তাহার মুখোমুখি বসিল।

শ্যামল। আচ্ছা, পরেশবাবু, আপনি বিশ্বাস করেন যে, মৃত আত্মা জীবিত কোন লোকের উপর প্রভাব বিস্তার ক'রে তার ইচ্ছামত কাজ করিয়ে নিতে পারে?

পরেশ। আপনি জানতে চাচ্ছেন, ভূতে আমার বিশ্বাস আছে কি না?

শ্যামল। বরুন, তাই-ই জানতে চাই।

পরেশ। হ্যাঁ, আছে।

শ্যামল। অলক্ষ্যে থেকে তার ইচ্ছেমত কাজ করিয়ে নেয়?

পরেশ। হাঁ, তা পারে বৈ-কি।

[শ্যামল উঠিয়া ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

আপনি বড় চঞ্চল হয়ে উঠেচেন, শ্যামবাবু।

শ্যামল। এই দেখুন পরেশবাবু, এই যে আমার নাম শ্যাম, এও কি ক'রে হয়েচে জানেন?

পরেশ। বাপ-মা দিয়েছিলেন ব'লে।

শ্যামল। না। অদৃশ্য আত্মার প্রভাব। সে প্রভাবে নাম যায় পাল্টে, লোকও বদলে যায়। আজ আমি ফিটারের অর্থাৎ মিস্ত্রীর কাজ করচি; কোন দিন ও-সব শিখিনি, ভাবিওনি যে একদিন এ-কাজ করতে হবে। কেমন ক'রে হোলো জানেন! শুনবেন? ওই অদৃশ্য এক আত্মার প্রভাবে।

পরেশ। আপনি এ-ঘরে একা থাকবেন না।

শ্যামল। এ ঘরে ত নয়, এ-ঘরে ত নয়।

[শ্যামল বসিল।

শহরের আর এক প্রান্তে, তিন বছর আগে, একটি লোক সহসা একদিন মারা গেল। তারই আত্মা, জানলেন পরেশবাবু, তারই আত্মা আমার উপর ভর করেচে। সে যা যা করত, আমাকে দিয়েও তাই করিয়ে নিতে চাচ্ছে। সে শিক্ষিত ছিল, সে ভদ্র ছিল, তবু সমাজে সে স্থান পেল না—নেমে গেল, খুব নীচে, কদর্য্যতার মাঝে, বীভৎসতার মাঝে, একেবারে পশুত্বের স্তরে। আমাকেও সেইখানেই ঠেলে নিয়ে চলেচে। বাধা দিতে পারচিনে। জানলেন, পরেশবাবু, বুঝলেন।

পরেশ। না, আমি কিছুই বুঝতে পারচি না।

শ্যামল। আপনি বুঝতে পারবেন না। শুনুন। এই যে মানুষ মরে, অস্বাভাবিক কারণে মরে, এ তার শক্তি ফুরিয়ে যায় ব'লে নয়—পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থার দোষে। যদি অনুকূল পারিপার্শ্বিক হোতো, তাহ'লে মরত না। তারা মরে। কিন্তু তাদের অভিযোগ থেকেই যায়। কেবল তাদের দেহ থাকেনা ব'লে অভিযোগও পায়না ভাষা। ভাষা দেবার লোকের সন্ধান চলে,—সন্ধান চলে এমন লোকের, যার অন্তরে ব্যথা রয়েচে, জ্বালা রয়েচে, প্রতিবাদ জ'মে উঠেচে। যখন তেম্নি কোন লোকের সন্ধান পায়, তখন তারই ওপর করে ভর। যুগ-যুগের অভিযোগ এম্নি ক'রেই যুগ-যুগান্তে নীত হয়, সঞ্চিত হয়ে থাকে। তারপর একদিন জানলেন পরেশবাবু, একদিন যখন সুপাত্রের সন্ধান মেলে,—প্রতিবাদ তখন মুখর হয়ে ওঠে, বিদ্রোহের বহ্নিশিখা অব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত সব কিছু ভস্ম ক'রে দেয়, অতৃপ্ত আত্মা তৃপ্তি পায়, সমাজে আবার চলে নব-সৃষ্টির প্রয়াস!

পরেশ। আপনার একটি কথাও আমি বুঝতে পারলুম না।

শ্যামল। কেমন ক'রে বুঝবেন, চিন্তাধারার স্রোত যে রুদ্ধ হয়ে আছে।

পরেশ। ও-সব কথা ভাববার দরকার কি?

শ্যামল। পারেন, পরেশবাবু, পারেন এ থেকে আমাকে মুক্ত করতে।

পরেশ। আমিত' বলি, সারাদিনের খাটুনি, সন্ধ্যেয় একটু আমোদ করুন, স্ফূর্তি করুন, দুশ্চিন্তা দূরে যাবে।

শ্যামল। জানেন পরেশবাবু, মাঝে মাঝে আমার মদও খেতে ইচ্ছে করে।

পরেশ। একটু আধটু খাওয়া মন্দ কি!

শ্যামল। আপনি খান।

পরেশ। না।

শ্যামল। তবে আমার খেতে ইচ্ছে হয় কেন?

পরেশ। দুরন্ত খাটুনি, তারপর এই দুশ্চিন্তা।

শ্যামল। আপনি কিছুই জানেন না পরেশবাবু। এ সেই হরলাল মিস্ত্রীর অতৃপ্ত আত্মার প্রভাব। আমায় টান্‌চে। নীচে টান্‌চে। সে নাকি আমার চেয়ে শক্তিমান। দেখি, তার শক্তি কত!

[উঠিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

পরেশ। আপনি বসুন শ্যামবাবু। আমি এখন উঠি।

[উঠিয়া দাঁড়াইল।

শ্যামল। ভয় পেলেন বুঝি! বাইরের এই রূপ দেখেই ভয় পাচ্ছেন পরেশবাবু, অন্তর তো দেখতে পান না! দেখলে মূর্চ্ছা যেতেন। জানেন, পরেশ বাবু, মদ এক বোতল আমি কিনেও রেখেচি।

পরেশ। এক দিন খেয়েই দেখুন না। দুশ্চিন্তা ভুলে যাবেন।

শ্যামল। না। ভুলতে চাই না। মানুষের বুকে বুকে এই দুশ্চিন্তা আমি জাগিয়ে তুলতে চাই। তারা ক্ষেপে উঠুক, ভেঙে ফেলুক মানুষ-মেরে-ফেলবার যত সব যন্ত্র।

পরেশ। আচ্ছা, আমি এখন যাই শ্যামবাবু।

শ্যামল। বড় ভয় পেয়েচেন আপনি। আচ্ছা, আসুন এখন।

[পরেশ চলিয়া গেল। শ্যামল চাহিয়া চাহিয়া তাহাকে দেখিল।

ওই বা থাকবে কেন? পরিতোষ প্রীতি দিতে চেয়েছিল, পারল না—সুখদা স্নেহধারায় অভিষিক্ত ক'রে বেদনার বিষ ধুয়ে ফেলতে চেয়েছিল, পারল না। পারবে কেন? কত হরলালের, কত শিক্ষিত দুর্দ্দশাগ্রস্ত যুবকের অতৃপ্ত আত্মা যে আমারই ভিতর দিয়ে অভিযোগ প্রকাশ করতে চাইছে, আমারই ভিতর দিয়ে ক'রতে চাইছে প্রতিবাদ!

[ধীরে ধীরে অক্ষয় আসিয়া দাঁড়াইল।

এই যে আপনি এসেচেন!

অক্ষয়। আমি এনিছি।

শ্যামল। দিন।

অক্ষয়। দোরটা আগে বন্ধ করুন।

[শ্যামল গিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া আসিল।

শ্যামল। দিন এইবার।

[অক্ষয় একটি পিস্তল বাহির করিয়া দিল। শ্যামল সাগ্রহে তাহা লইল।

কি করতে হবে।

অক্ষয়। সময়ে সবই জানতে পাবেন।

শ্যামল। কিন্তু আমিত' হত্যা করতে চাই না। আমি চাই বর্ত্তমানকে প্রতিরোধ করতে।

অক্ষয়। বর্ত্তমানেই ত রয়েচে যত অনিয়মের মূল, তাই সমূলে একে উৎপাটিত করতে হবে।

শ্যামল। তারপর?

অক্ষয়। তারপর আবার কি?

শ্যামল। তারপর আর কিছু নেই? তা যদি না থাকে, তাহ'লে ফিরিয়ে নিয়ে যান এই অস্ত্র। এতে আমার প্রয়োজন নেই।

অক্ষয়। আপনি মুক্তি চান না?

শ্যামল। চাই বৈ কি! কিন্তু অস্ত্র সে মুক্তি দিতে পারে না।

অক্ষয়। কে পারে?

শ্যামল। মানুষ। কিন্তু এই মানুষ যদি আজকার মন নিয়ে, বুদ্ধি নিয়ে, বিচার নিয়েই বেঁচে থাকে, তাহ'লে এই অস্ত্র তার হাতে উঠে অবিচারেরই সহায়তা করবে। পৃথিবী জুড়ে আজ তাই চল্‌ছে। তাই দেশে দেশে আজ হরলালের অতৃপ্ত আত্মা ছুটে বেড়ায়, পাত্র খুঁজে বেড়ায়, যার ভিতর দিয়ে সে প্রতিবাদ প্রকাশ করবে।

অক্ষয়। কিন্তু শক্তিহীনের প্রতিবাদের সার্থকতা কোথায়?

শ্যামল। শক্তিহীনের সাধ্য কি যে প্রতিবাদ করে? ধর্ম্মের, কর্ম্মের, আদর্শের এই যে ব্যভিচার চলচে দেশে দেশে, এর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে যে-লোক প্রতিবাদ করবে—সে কি শক্তিহীন? হরলাল মিস্ত্রী শক্তিহীন ছিল না। অস্ত্রের বিদ্রোহ, আজ বিদ্রোহ নয়। মানুষের আজকের দিনের এই চিন্তাধারার গতিরোধ করবার জন্য রুখে দাঁড়ানোই হচ্ছে বিদ্রোহ। সেই বিদ্রোহের ফলেই হবে নব-সৃষ্টি। বিদ্রোহের সার্থকতাও সেইখানে। নইলে রামের বদলে শ্যামের অথবা শ্যাম, হরি, যদু, মধুর প্রভুত্ব মানুষকে মুক্তি দিতে পারবে না। বিদ্রোহ সম্বন্ধে আমার ধারণা হচ্ছে এই রকম, আপনাদের ভিন্ন। সুতরাং আমার আর আপনাদের পথ এক নয়। আপনার এ অস্ত্র আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

অক্ষয়। কিন্তু এ-কথা ত' আপনি আগে বলেন নি।

শ্যামল। আগে ত' এ-সব কথা মনে হয়নি।

অক্ষয়। কিন্তু আমাদের গুপ্ত অভিসন্ধি আপনি যে জেনে নিলেন!

শ্যামল। এই অস্ত্র নিন। গুপ্ত অভিসন্ধি ব্যক্ত করবার শক্তি যাতে আমার না থাকে, সেই ব্যবস্থা করুন।

[পিস্তলটি আগাইয়া দিল।

এখানে সুবিধে না হয়, বলুন কোথায় যেতে হবে?

[অক্ষয় বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বলুন।

অক্ষয়। কোথাও যেতে হবে না। আপনাকে আমি অবিশ্বাস করি না।

শ্যামল। তাহ'লে আমার অনাবশ্যক এই জিনিষটি নিয়ে যান।

অক্ষয়। আজকের মতো আপনার কাছেই থাক। কাল এসে নিয়ে যাব।

শ্যামল। বোধ হয় দেখতে চান, এর দ্বারা আমি প্রভাবান্বিত হই কিনা, কেমন?

অক্ষয়। না, আমাকে অনেক জায়গা ঘুরতে হবে। সঙ্গে রাখা নিরাপদ নয়।

শ্যামল। বেশ, তা'হ'লে আমার কাছেই থাক। কোন আপদের বালাই নেই এখানে।

[অক্ষয় দ্বারের দিকে ফিরিল।

আপনি চল্লেন?

অক্ষয়। হাঁ, আমার একটু কাজ আছে। নমস্কার।

শ্যামল। নমস্কার!

[অক্ষয়ের পিছন পিছন শ্যামল দুয়ার অবধি অগ্রসর হইল। অক্ষয় বাহির হইয়া গেলে শ্যামল দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল।

তারপর ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া পিস্তলটি দেখিতে লাগিল।

তোমারও আকর্ষণ আছে। মরণের উল্লাস!

[পিস্তলটি টেবিলের উপর রাখিল। তক্তপোষের তলা হইতে ট্রাঙ্ক টানিয়া বাহির করিল। তাহার ভিতর হইতে মদের বোতল বাহির করিল। হাতে লইয়া তাহাও দেখিল।

তোমারও, তোমারও সুন্দরী আকর্ষণ আছে। বুক ভরা আছে মরণের উল্লাস!

[বাহির হইতে পরেশ কড়া নাড়িল। শ্যামল একখানা কাগজ দিয়া পিস্তলটি চাপা দিল।

পরেশ। শ্যামবাবু, শুনচেন শ্যামবাবু।

[শ্যামল দুয়ার খুলিয়া দিল।

এই যে বোতল নিয়ে বসেচেন, বেশ, বেশ। একটি ভদ্র-লোক আপনার বন্ধু শ্যামলবাবুকে খুঁজতে এসেচেন। তিনি শুনেছিলেন, এই বাড়ীতেই শ্যামলবাবু থাকেন। আমি বললুম, তাঁর বন্ধু শ্যামবাবু এখানে থাকেন। ঠিকানাটা চাইছেন।

শ্যামল। কোথায় তিনি?

পরেশ। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রয়েচেন।

শ্যামল। দয়া ক'রে এই ঘরে পাঠিয়ে দিন।

পরেশ। আমি আর আসব না। একটু বেরুতে হবে।

শ্যামল। বেশ, কাল দেখা হবে।

[পরেশ চলিয়া গেল।

তিন বছরের ভিতর পূর্ব্ব-পরিচিত কেউ দেখা করতে আসেনি! ভুলে-যাওয়া জগৎ থেকে কে আজ এলো!

[একটি বৃদ্ধ দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন—নাম গোবিন্দ মুখুজ্যে।

গোবিন্দ। শ্যামল কোথায় থাকে জানেন?

শ্যামল। এই ঘরেই আছে, আসুন।

[বাতিটা তুলিয়া মাথার উপর ধরিল।

আপনি! মাষ্টার মশাই!

গোবিন্দ। তুমি শ্যামল!

শ্যামল। চিন্তে পারচেন না!

গোবিন্দ। হাঁ, তুমিই শ্যামল ছিলে।

[শ্যামল বাতিটা টেবিলের উপর রাখিতে রাখিতে কহিল।

শ্যামল। ঠিক বলেচেন মাষ্টার মশাই, শ্যামল ছিলুম—এখন শ্যাম।

[অগ্রসর হইয়া একটা চেয়ার ঠেলিয়া দিয়া কহিল।

বসুন।

গোবিন্দ। না, আর বোসব না।

শ্যামল। বসবেন না, তবে এলেন কেন?

গোবিন্দ। এমন অধঃপাতে যে গেছ, তা জান্তুম না। জানলে আসতুম না।

শ্যামল। কার কাছে আমার ঠিকানা পেলেন, কষ্ট ক'রে এলেনই বা কেন, এসে কিছু না ব'লেই বা চ'লে যেতে চাইছেন কেন, এ-সব কিছুই কি জান্তে পারি না?

গোবিন্দ। না, কোন কিছু জানবার অধিকার তোমার নেই।

শ্যামল। অধিকারের দাবী নয় মাষ্টার মশাই, এ সামান্য কৌতূহল, মানুষমাত্রেরই থাকা স্বাভাবিক।

গোবিন্দ। কিন্তু যে হচ্ছে মানুষের কলঙ্ক, তার কৌতূহল নিবারণ করা গোবিন্দ মুখুজ্জে প্রয়োজন ব'লে মনে করে না। ছিঃ! শ্যামল, শিক্ষিত তুমি, সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান তুমি,শেষটায় এই কদর্য্যতার মাঝে নেমে এলে!

[শ্যামল গোবিন্দবাবুকে ধরিয়া বসাইবার চেষ্টা করিয়া কহিল।

শ্যামল। আপনি বসুন মাষ্টার মশাই। ব'সে সুস্থ চিত্তে আপনার বক্তব্য ব'লে যান।

গোবিন্দ। তোমার বাবার বন্ধু ব'লেই তোমার ওপর আমার স্নেহ ছিল। তোমাকে শিক্ষা দেবার সময় কত আশাই না করতুম, তোমার ওপর কত ভরসাই না রাখতুম।

শ্যামল। আশা আকাঙ্ক্ষা কি আমারই কম ছিল!

গোবিন্দ। উচ্চাকাঙ্ক্ষা যদি তোমার থাকত, তাহ'লে এত নীচে তুমি নামতে পারতে না। তুমি শুধু তোমার পরিবারের কলঙ্ক নয়, বন্ধু-বান্ধবের কলঙ্ক নয়, সমগ্র শিক্ষিত সমাজের কলঙ্ক।

শ্যামল। আমাকে কিন্তু বিঁধচে না মাষ্টার মশাই! আমি তা জানি ব'লেই ত' আপনাদের সমাজে আসন নিতে যাইনি, পিতৃদত্ত নাম, শিক্ষিতদের পেশা, সভ্যতার সম্ভ্রম সব ত্যাগ ক'রে এইখানে প'ড়ে আছি।

গোবিন্দ। মদ্যপ, বেশ্যাসক্ত, নীচাশয়, তুমি একদিনও যে আমার ছাত্র ছিলে, এ-কথা ভাবতেও আমার লজ্জা হয়।

শ্যামল। আজ শুধু আপনিই লজ্জিত হচ্ছেন মাষ্টার মশাই; কিন্তু আপনারা সকলে মিলে যে-দিন কৃতকর্ম্মের জন্যে লজ্জায় অধোবদন হয়ে ব'সে থাকবেন সেই দিন—হাঁ,সেই দিনই হবে আমার এই ব্রত উদ্‌যাপন।

গোবিন্দ। হীনতার সর্ব্বনিম্ন স্তরে দাঁড়িয়ে আজও তুমি এই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে পারচ দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি। জিজ্ঞাসা করি, এই কুৎসিৎ পথে পা না বাড়িয়ে মরতে পারনি কেন?

শ্যামল। মরণ, মাষ্টার মশাই! সুযোগ এতদিন জোটেনি, তাই মরণের পথে এগুতে পারিনি।

গোবিন্দ। আজ ব'লে যাচ্ছি, সেই পথই দেখ, ম'রে এই কলঙ্ক ঘোচাও।

[গো'বিন্দ মুখুজ্জো উঠিয়া দাঁড়াইল।

শ্যামল। বসুন মাষ্টার মশাই। আপনার চরম আদেশ শুনিয়েচেন, আমারও চরম জবাব নিয়ে যান।

গোবিন্দ। তোমার কোন কথা আমি শুনতে চাইনা।

শ্যামল। শুনতেই হবে।

গোবিন্দ। তুমি আমাকে চোখ রাঙাবে?

শ্যামল। আমার অনুরোধ।

গোবিন্দ। উচ্চ শিক্ষার, উচ্চ বংশের, উন্নত আদর্শের, মার্জ্জিত রুচির এবং সুনীতির যে অমর্য্যাদা করে, গোবিন্দ মুখুজ্জে, শুধু গোবিন্দ মুখুজ্জে কেন, কোন ভদ্রলোক তার কথায় কর্ণপাত করে না।

[শ্যামল ক্ষিপ্রহস্তে কাগজ সরাইয়া পিস্তলটা বাহির করিল।

শ্যামল। বসুন।

[গোবিন্দ মুখুজ্জে কিয়ৎকাল আচ্ছন্নের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করিলেন।

গোবিন্দ। গুণ্ডার দলেও যোগ দিয়েচ. দেখচি।

[শ্যামল কোন কথা কহিল না। দরজার খিল বন্ধ করিয়া দিল। তারপর বিছানার চাদর তুলিয়া লইয়া গোবিন্দকে চেয়ারের সহিত বাঁধিতে উদ্যত হইল।

ও-কি করচ। আমাকে কি খুন করতে চাও?

শ্যামল! না মাষ্টার মশাই, আমার জবাব শোনাতে চাই, মরণের পথ দেখিচি কি না, তাই বুঝিয়ে দিতে চাই।

[বাঁধিতে লাগিল!

গোবিন্দ। আচ্ছা মাতালের হাতে পড়েচি যা হোক্।

শ্যামল। মদ খাইনা মাষ্টার মশাই।

গোবিন্দ। বোতল এখনও রয়েচে।

[বাঁধা শেষ করিয়া।

শ্যামল। কখনো খাইনি, কিন্তু এখন খাব। হরলাল মিস্ত্রী! তোমারই জয় হোলো।

[বোতলের ছিপি খুলিতে লাগিল।

গোবিন্দ। আমার সামনে তুমি মদ খাবে, আর আমি তাই দেখব।

[একটা গ্লাস আনিয়া মদ ঢালিতে ঢালিতে শ্যামল কহিল।

শ্যামল। প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিলুম আপনার কাছে, আর আজ জীবনে এই প্রথম পেগ গ্রহণ করছি আপনারই সামনে দাঁড়িয়ে, মাষ্টার মশাই।

গোবিন্দ। না। আমি এ সইব না। কে আছ? এ ঘরের বাইরে কে আছ?

[শ্যামল আবার পিস্তলটা তুলিয়া লইল।

শ্যামল। মাষ্টার মশাই!

গোবিন্দ। সত্যিই কি আজ তুমি আমাকে খুন করবে?

শ্যামল। সত্যিই খুন করব না। মারণ-মন্ত্রে দীক্ষা দিতে যে আজ এসেছিল, তাকে ফিরিয়ে দিয়েচি। এ-কাজ আমার নয়। হরলাল মিস্ত্রীর আত্মা আজ জয়ী হয়েচে, আজ তারই হয়ে জবাব দোব, প্রতিবাদ জানাব। আপনাকে শেষ অবধি চুপ ক'রে ব'সে থাকতে হবে, সব কথা নীরবে শুনতে হবে। কিন্তু গোল করলেই কিংবা লোক ডাকলেই আমি গুলি করব।

গোবিন্দ। না বাবা, গোল আমি করব না।

শ্যামল। মাষ্টার মশাই, মৃত্যুর পথে পা বাড়াতে পারিনি ব'লে আমাকে ভৎর্সনা করছিলেন। দেখলেন ত' মৃত্যুর ভয় আপনাকে কেমন ক'রে আড়ষ্ট ক'রে ফেল্ল! আর আমি, চেয়ে চেয়ে দেখুন।

[টেবিল হাতড়াইয়া একখানা ছোরা বাহির করিয়া লইল।

দেখুন, কেমন নির্ভয়ে সচ্ছন্দচিত্তে মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি।

[ছোরা দিয়া বাঁ হাতের শিরা ধমনী সব কাটিয়া দিল।

মাষ্টার মশাই!

গোবিন্দ। কী সর্ব্বনাশ করলে তুমি! এ কি ক'রলে? ওকি রক্ত! ওকি রক্ত!

[ছোরা ফেলিয়া দিয়া আবার পিস্তল তুলিয়া ধরিল।

শ্যামল। মাষ্টার মশাই, আপনার কণ্ঠস্বর যেন না এই চার-দেয়ালের বাইরে যায়।

গোবিন্দ। বন্ধ কর, বন্ধ কর, ওই রক্তের প্রস্রবণ বন্ধ কর, শ্যামল।

[শ্যামল আর একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া গোবিন্দের সম্মুখে বসিল।

শ্যামল। হরলাল মিস্ত্রীও এই রকম ক'রে আমার সামনে হৃদয়ের রক্ত ঢেলে দিয়েছিল। সে-ও ছিল শিক্ষিত, সে-ও ছিল ভদ্রবংশজাত।

গোবিন্দ। বন্ধ কর, বাবা, ওই রক্ত বন্ধ কর। জীবন অমূল্য ধন, এম্নি ক'রে তা নষ্ট করোনা।

শ্যামল। সে কোন্ জীবন মাষ্টার মশাই? সে জীবনের স্বাদ ত আপনাদের

জন্যেই পেলুম না। আপনারা শিক্ষা দিলেন, ডিগ্রী দিলেন, কিন্তু জীবনকে অমূল্য ব'লে যাতে বুঝতে পারি, তার ব্যবস্থা ত কিছু ক'রে দেননি।

গোবিন্দ। মান দিয়েচি, মর্য্যাদা দিয়েচি, জ্ঞান দিয়েছি, জীবনের পথ দেখিয়ে দিয়েচি।

শ্যামল। তারপর? তারপর যখন জীবিকার্জ্জনের জন্যে চাকরির উমেদারী ক'রে ভিক্ষুকের মত লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়েছি, তখন জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতালাভের জন্যে শুষ্ক উপদেশ ব্যতীত আর কিছু কি দিয়েছিলেন? গৃহে স্থান রইলনা, সমাজ সবলে দূরে সরিয়ে দিল, স্বার্থের সংঘর্ষে প্রাণ অতিষ্ট হয়ে উঠল যখন, তখনই বা কি করেছিলেন?

গোবিন্দ। আর আমাদের কি শক্তি আছে, কী আমরা করতে পারি, বাবা?

শ্যামল। শক্তি যদি নেই, সামর্থ্যের যদি এতই অভাব, তাহ'লে তোমাদের এ স্পর্দ্ধা কেন যে, তোমরা মানুষ তৈরি করবার ভার নাও। তোমাদের অভিধানে মানুষের সংজ্ঞা কি দারিদ্র্যপ্রপীড়িত, দেহের ও মনের ব্যাধিতে প্রায়-পক্ষাঘাতগ্রস্ত, একান্ত অসহায় দ্বিপদ দুর্ব্বল জীব? মানুষ হয়েচে ব'লে ডিগ্রীর ছাপ দিয়ে যাকে ছেড়ে দিয়েছিলে, তারই উষ্ণ-রক্তস্নাত শিক্ষক তুমি, বুকে হাত দিয়ে বলত', অর্থের বিনিময়ে যা তোমরা দিয়েচ, কেবল তারই জোরে, তারই মহিমায় সকলে সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে কি না?

গোবিন্দ। তোমার সমস্ত মুখ শাদা হয়ে গেছে।

শ্যামল। কিন্তু লজ্জায় তোমার মুখ এখনো রাঙা হয়ে ওঠেনি, মাষ্টার মশাই। শুনে যাও নীতিবিদ্ শুচিপরায়ণ শিক্ষক, আমি মগুপ নই, বেশ্যাসক্ত নই, নীচাশয় নই—তবুও আমাকে এম্নি হীন জীবনই যাপন করতে হচ্চে। আমারই মত এম্নি কত অকলঙ্কিত জীবন শুধু তোমাদেরই ভুলে, তোমাদেরই অবহেলায়, ভাবনাবিহীন ব্যবস্থার চাপে অকালে আত্মবলি দিয়ে লাঞ্ছনার গ্লানি থেকে অব্যাহতি লাভ করচে। আর যারা সেই নির্ম্মম নিয়তির নির্দ্দেশ পায়নি, তারাও আপিসে, আদালতে, কলে, কারখানায় এমন জীবন যাপন করচে, যা দেখে সত্যিকারের মানুষ আতঙ্কে শিউরে ওঠে।

গোবিন্দ। তুমি হাঁপাচ্চ, শ্যামল, সব রক্ত তোমার বেরিয়ে যাচ্ছে!

শ্যামল। যাক্ মাষ্টার মশাই। এই বুকের রক্ত এম্নি ক'রেই ব'য়ে যাক্, শতধারায় ব'য়ে বাংলাদেশকে ডুবিয়ে দিক, তলিয়ে দিক ভুলের ওপর গড়া আজকের মানুষের যত সমস্ত অসার প্রতিষ্ঠান।

গোবিন্দ। তোমার চোখ নিষ্প্রভ হয়ে উঠ্‌চে, শ্যামল।

শ্যামল। এখনো দেখতে পাচ্ছি, মাষ্টার মশাই, হরলাল মিস্ত্রীর রক্ত ... এখনো বুঝতে পারছি, অযুত তরুণের ব্যর্থতার বেদনা...মাষ্টার মশাই, আমার জবাব শেষ...জীবনও শেষ...ব্যর্থতার বেদনায় মৃত, মুমূর্ষু, অর্দ্ধমৃত, সকল নর-নারীর প্রতিনিধি হিসেবে প্রচলিত রাষ্ট্র সমাজের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই হোলো আমার প্রাণঢালা প্রতিবাদ ... ...

[শ্যামলের প্রাণহীন দেহ মাটিতে পড়িয়া গেল।

গোবিন্দ। শ্যামল! শ্যামল! এ কী শাস্তি দিয়ে গেলি তুই, ওরে, বাংলার দুলাল!

যবনিকা

চিত্রাভিনেতা

[শ্রীঅমরদাস মল্লিক]

আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র চলচ্চিত্র তার মায়াজাল বিস্তার ক'রে মানুষের মনকে এমনভাবে আকৃষ্ট করেছে, যার ফলে 'ছবি দেখা' হয়ে উঠেছে মানুষের একটা দৈনন্দিন আমোদ-প্রমোদের বিষয়।

এই ব্যাপারে রঙ্গমঞ্চের প্রতি নাকি অনেকে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন। এমন কি, মঞ্চের অভিনেতাদের মধ্যে অনেকে এর কবলে আত্মসমর্পণ ক'রে আর তাঁদের পরিত্যক্ত মঞ্চে ফিরে যেতে চাইছেন না। চলচ্চিত্রের এই আধিপত্যে মঞ্চের ভক্তরা হয়ত একটু রুষ্টও হয়েছেন। চলচ্চিত্রের এহেন আধিপত্যের কারণ কি, তা' নির্ণয় করবার চেষ্টা না ক'রে বায়োস্কোপ এবং থিয়েটার সম্পর্কে সম্প্রতি যে প্রশ্নটী অতি মাত্রায় তীব্র হ'য়ে উঠেছে, সেই সম্বন্ধেই আপাততঃ আমি আমার নিজের দু'একটি কথা বলব।

এ-কথা বোধ হয় কারুরই অজানা নেই যে, চলচ্চিত্রে অভিনয়ের পদ্ধতি রঙ্গমঞ্চের অভিনয়-রীতি থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই বিভিন্নতা মাত্র অভিনেতার প্রকাশভঙ্গীতেই নয়, অভিনয়ের ভিতর দিয়ে চরিত্রগত ভাবপ্রকাশের সুযোগসুবিধার ভিতরেও এই পার্থক্য খুব বড়ো হয়ে দেখা দেয়। এবং এই কারণেই বিলিতি ও দেশী, বহু পত্রিকা মারফত অনেকেই জানতে চান—অভিনয় ব্যাপারে মঞ্চাভিনেতা বড়ো, না চলচ্চিত্রাভিনেতা বড়ো? দু'জনের মধ্যে কৃতিত্ব বেশী কার? আমি আমার বায়োস্কোপীয় অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এর সহজ উত্তর হচ্ছে, কৃতিত্ব বেশী চলচ্চিত্রাভিনেতার। কারণ যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে এই শিল্পীটীকে তাঁর অভিনয়নৈপুণ্য প্রকাশ করতে হয়, তা' ভাবপ্রকাশের বিশেষ অনুরূপ নয়। খণ্ড-খণ্ড ভাবে আংশিক অভিনয়ে অভিনেয় চরিত্রটীর অন্তরের ঘাতপ্রতিঘাত বাচনে ও ভঙ্গিমায় সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা যে কি দুঃসাধ্য ব্যাপার, তা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেউই যথার্থ উপলব্ধি করতে পারবেন ব'লে আমার মনে হয় না। হঠাৎ একজনকে শোকে অভিভূত হয়ে পড়তে হবে বা উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে হবে—পরিচালকের নির্দ্দেশ অনুযায়ী তা কৃতিত্বের সঙ্গে প্রকাশ করবার জন্যে যে পরিমাণে কল্পনাশক্তি ও একাগ্রতার প্রয়োজন হয়, তা সাধারণ শিল্পীর পক্ষে কখনই সম্ভবপর নয়। কাজেই যাঁরা এই 'ফরমাসী অভিনয়' সাধনায় যথার্থই ব্রতী, মাত্র তাঁরাই এদিক দিয়ে সাফল্য দাবী করবার আশা করেন। নচেৎ সামান্য শিল্পীর জীবনে এতে সফলতা লাভ করবার আশা বাতুলতা মাত্র। এ-ছাড়া কত যান্ত্রিক স্বচ্ছন্দতার উপরে যে অভিনেতার যশ নির্ভর করে, তা' সবাক ছবির যুগে আর বেশী ক'রে বলা বাহুল্য মাত্র। আরো একটা কথা আছে। দর্শকদের সংস্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে এই যে অভিনয়, এর মধ্যে বাইরের কোন প্রেরণা লাভ করবার উপায় নেই। সম্মুখস্থ জনমণ্ডলীর 'করতালি' বা প্রশংসাজ্ঞাপক নিদর্শনগুলি যে ভাবোন্মাদনায় কিরূপ সাহায্য করে, তা' মঞ্চাভিনেতা এবং মঞ্চাভিনয়ের দর্শক—উভয় পক্ষেরই বেশ ভালোরকম জানা আছে। আবার সবচেয়ে বিপদ এই যে, অভিনেতার নিজের এতটুকু স্বাধীনতা প্রকাশেরও সুযোগ নেই—সারাক্ষণ 'ডিরেক্টার' 'ক্যামেরাম্যান' 'সাউণ্ডম্যান' প্রভৃতির ইচ্ছানুসারেই অভিনেতাকে চালিত হ'তে হয়। পরীক্ষাভয়াতুর ছাত্রের অবস্থা বোধ হয় এর চেয়ে ঢের ভাল। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়েও যে শিল্পী নিজের কৃতিত্ব প্রদর্শন ক'রে জনসাধারণের প্রশংসালাভে সমর্থ হন—তিনি প্রকৃতই ভাগ্যবান, তিনি প্রকৃতই শিল্পী, তাঁর নাটনিপুণতার তুলনা নেই।

রেকুইজিসন্-ম্যান্

[শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য]

নাচঘরে—
কাজ করে
রেকুইজিসন্-ম্যান্।
—শশা বীচি, সমুদ্রের ফেণা
বরা'দন্ত, লক্ষ্মীর পুঁথির কাপি,
সব নিয়ে দিদিমার ঝাঁপি—
আছে
তার কাছে।
পুরাতন টেলিফোন্ গাইড্
সোণালি কাগজে মুড়
বানায় 'কোরাণ'—
গোলাপী লাইমেড্
নক্সী বোতলে পুরি
সাজায় পানীয় দান।
উর্দ্দু হ্যাণ্ডবিলে
লাল শালু এঁটে
বানায় ফার্মান
রেকুইজিসান্-ম্যান্,
যার বলে বাদসা খোশ দিলে
রাজ্য দেয় বেঁটে।
যেই প্যাকাটির শরে
মহাবীর পড়ে
রেকুইজিসন্-ম্যান্ তাই গড়ে।
সময়ে ঘড়িটি
ছাতাটি লাঠিটি
বোবা টাকা
আর গান্ধী-মার্কা নোট
কাঠের বন্দুক
টয় পিস্টল
যোগানো মঞ্চের 'পরে
কর্ত্তব্য তাহার।
এধার ওধার
হইলে সকল মাটি;
বড় অভিনেতা মারে তারে চাটি
ছোট অভিনেতা করে গে' নালিশ।
বিছানায় দেয়নি বালিশ,
কামান দাগিল, হ'লনা আওয়াজ
এই সিন্ তাই জমিল না আজ।
রেকুইজিসন্-ম্যান্—
কেহ তারে করে না সম্মান।
সে যে আছে—
দর্শকের কাছে
তার খোঁজ নাই।
সে নাহি থাকিলে
অভিনয় হ'ত সুকঠিন;
নহে এতদিন
মুনিব কি রাখিত তাহারে?
গাগরী ভরণে-ওলী
তার ঠাঁই চায় যে গাগরী;
যেই ফুলমালা
নাগরেরে পরায় নাগরী—
সে যোগায়।
শকুনির পাশা,
ভিক্ষুকের ঝুলি,
চাণক্যের পুঁথি—
উর্ব্বশীর শাপমুক্তি হেতু
অষ্টবজ্র প্রয়োজন?—
অষ্টবজ্র যোগাইবে
রিকুইজিসন্-ম্যান্।
পিছপাও কিছুতে সে নয়;
তরবারি না থাকিলে
শুধু বাঁট বাঁধিয়া সে দেয়—
ফুল নাই?
আছে কাগজের কুচি।
দোয়াতে থাকে না কালী
কলমে থাকে না নিব
তামাকে থাকে না ধোঁয়া
তবু দর্শকেরা হবে খুসী—
জানে সে মঞ্চের মায়া।
নহে,
ভাঙা ঘড়াঞ্চিরে ঢাকি
ছেঁড়া কারপেটে
করিতে তৈয়ার
তক্ত তাউস
হইত লজ্জিত নিজে
রেকুইজিসন্-ম্যান্।

বাংলা ছবি

[শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া]

বাংলা ছবি!......

প্রডিউসার যদি ডেকে বলেন,—"ওহে, একটা বাংলা ছবি করতে হবে", অমনি পরিচালক ভাবতে বস্লেন।......

ভাবনা হয়—কারণ বাঙালী দর্শক সমজ্‌দার—ছবির ভালমন্দ যাচাই ক'রে নিতে জানে। বাঙালী দর্শক ছবির technique বোঝে--পরিচালনার সূক্ষ্ম touches উপলব্ধি করতে জানে। বাংলায় ফাঁকি চলে না—বাঙালী ভাল ছবি চায়, যাকে বলে Quality Picture. বাঙালীর এই উন্নত রুচি অনুযায়ী ছবি তৈরী করতে না পারলে প্রডিউসারকে ব্যবসার দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে। তাই ভাবনা হয়—

—আনন্দ হয়, কারণ বাংলা ছবি ক'রে, বাঙালী দর্শকদের সন্তুষ্ট করতে পারলে একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়।...এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, বাঙালী দর্শকদের মত সূক্ষ্মভাবে ছবির ভালমন্দ বিচার ক'রে দেখবার ক্ষমতা খুব কম অবাঙালী দর্শকদেরই আছে। তাই কোনও ছবি পরিচালনা ক'রে যদি বাঙালী দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে পারা যায়, তাহ'লে পরিচালকদের মন স্বতঃই আত্মপ্রসাদে ভ'রে ওঠে।

এই কথায় একটা প্রশ্ন ওঠে। বাঙালী দর্শকের এই যে বিচার-প্রবণতা—এবং তারই জন্যে প্রডিউসারের বাংলা ছবি করতে এই যে দ্বিধা, এতে বাংলার চিত্র-ব্যবসায়ের ক্ষতি কি লাভ? আমি বলি,—লাভ। হয়ত দু'একখানা ছবি বাঙালী না নিতে পারে, হয়ত এই ছবি ক'রে বাঙালী প্রডিউসার আপাততঃ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন, কিন্তু ছবি ভাল করবার এই যে চেষ্টা (যা বাংলা ছবি করবার সময় বিশেষ ক'রে ভাব্‌তে হয়)—এই জিনিষটা চিত্র-ব্যবসায়কে উন্নতির পথে অনেকখানি এগিয়ে দেয়। বাঙালী দর্শকের এই যে স্বাতন্ত্র্য, এটা বাংলার প্রডিউসারদের সব সময়েই একটা কথা মনে করিয়ে দেয় যে, "আরও ভাল ছবি চাই।"

প্রডিউসার বাংলা ছবির প্রযোজনায় উপেক্ষা দেখাতে পারেন না। কারণ মাথার উপরে বাঙালী দর্শক তাদের তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি নিয়ে সব সময়েই ভাল-মন্দ বিচার করবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। বাঙালীর এই উন্নত রুচি ও সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধিকে পরিতৃপ্ত করতে চেষ্টা ক'রেই আজ নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড ভারতের চিত্র-জগতে এত শীঘ্রই অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকার ব'লে পরিগণিত হ'তে পেরেছেন।

বাংলার দুর্ভাগ্য যে, সারা ভারতে বাংলা ভাষা-ভাষীর সংখ্যা এত কম। তাই বাংলা ছবির চেয়ে হিন্দী বা উর্দ্দু ছবি প্রডিউসারকে ব্যবসার দিক দিয়ে সাধারণতঃ বেশী লাভবান করে। এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, ব্যবসার দিক থেকে দেখতে গেলে বাংলা ছবির চেয়ে হিন্দী ছবি করলে লোকসানের সম্ভাবনা কম। যে ছবি বাংলা দর্শকের কাছে অচল, তেমন ছবিও হিন্দী ভাষায় হ'লে দশটা হাউসে ঘুরে প্রডিউসারের লোকসান বাঁচিয়ে দেয়। তা ছাড়া, একটা জনপ্রিয় বাংলা ছবি আর একটা জনপ্রিয় হিন্দী ছবি—এদের ভিতর যদি তুলনা করা যায়, তাহ'লেও দেখা যাবে যে, বাংলা ছবির চেয়ে হিন্দী ছবি ব্যবসার দিক থেকে ঢের বেশী লাভজনক। এই কারণেই বোধ হয়, প্রডিউসারদের হিন্দী বা উর্দ্দু ছবি তোলবার প্রবৃত্তি স্বতঃই বেশী হয়ে থাকে—আর বাংলা ছবির কথা উঠ্‌লেই প্রডিউসার, পরিচালক প্রভৃতি সবাই মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে ব'সে যান।—

বাংলার প্রডিউসার যদি প্রশ্ন করেন যে, হিন্দী ছবিতে লাভ নিশ্চিত জেনেও কেন বাংলা ছবি তুলতে গিয়ে তাঁরা অনিশ্চিতের মাঝখানে পা বাড়িয়ে দেবেন, তা হ'লে তার উত্তরে বাঙালী দর্শক শুধু যেন এই জবাবই দেয় যে, বাংলার দর্শক বাংলার প্রডিউসারদের কাছ থেকে ক্রমাগত ভাল

রাধা ফিল্মসের হিন্দী রাজনটী-চিত্রের একটী দৃশ্যে
মিঃ নির্ম্মলকান্ত ও শ্রীমতী কলিকা

ছবি দাবী ক'রেই বাংলার চিত্রজগতের এই উন্নতি সাধন করেছে; ভারতীয় চিত্রজগতে বাঙলা দেশ আজ যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রতে পেরেছে, তার জন্যে একমাত্র দায়ী হচ্ছে বাঙালী দর্শক; আর যে-দিন বাঙালী দর্শক খারাপ ছবি দেখেও নির্ব্বাক হয়ে তা সহ্য ক'রে যাবে, সে-দিন থেকেই আরম্ভ হবে বাংলার চিত্রশিল্পের অবনতি। বাংলা ছবি করতে গিয়েই বাঙালী ভাল ছবি করতে শিখেছে এবং—শিখবে...

প্রশ্নের সমাধান কিছু হ'ল কি?

—:•:—

সঙ্গীত ও শ্রোতা

শ্রীতিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য

বর্ত্তমানে 'ক্লাসিকাল' সঙ্গীত বলিতে যাহা বোঝায়, মুসলমান রাজত্ব-কালেই তাহার বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। তখনকার নবাব এবং বাদশাহগণ গুণী ও সঙ্গীতজ্ঞদের ভরণপোষণ এবং যাবতীয় ভার বহন করিয়া সঙ্গীতকলার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। কিন্তু সম্রাট-দিগের মধ্যে সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকের অভাব না থাকিলেও সাধারণ হিসাবে সঙ্গীতকে বিলাসিতার উপকরণ বলিয়াই গণ্য করা হইত। বলা বাহুল্য, সে সময়ে কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র-সঙ্গীতেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

এতদ্দেশীয় সঙ্গীত-যন্ত্রে শ্রুতি, মীড়, গমক প্রভৃতি ভারতীয় রাগ-বৈশিষ্ট্য সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যাইলেও সুরের উচ্চতার দিক দিয়া ইউরোপীয় যন্ত্রগুলি যে এদেশের যন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের যন্ত্রগুলির ভিতর দিয়া স্বর বা সুরের উচ্চতা কিরূপে বর্দ্ধিত হইতে পারে, এ বিষয়ে কোন চেষ্টা করার আবশ্যকতা হয় নাই। ইহার আনুমানিক কারণ এই যে, মধ্য যুগে সাধারণের মধ্যে সঙ্গীতানুরাগ এক প্রকার লোপ পাইয়াছিল বলিলেও হয়। অন্ততঃ কলা হিসাবে সঙ্গীত-চর্চ্চা যে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিলনা, একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। সঙ্গীত এবং সঙ্গতের যাহা কিছু চর্চ্চা, তাহা নবাব বা রাজ দরবারের ভিতরেই সীমাবদ্ধ ছিল। সপার্ষদ নবাব বাদসাহকে শোনাইবার জন্য যন্ত্রের মৃদুতায় কোনই ক্ষতি হইত না, বরং সুরের মিষ্টত্বের দিকেই যন্ত্রীদের বিশেষ লক্ষ্য থাকায় সুরের মৃদুতাই তাহাদের নিকট প্রার্থনীয় ছিল। তাহা ছাড়া উচ্চ শব্দ হেতু নবাবের কৃত্রিম তন্দ্রার ব্যাঘাত ঘটিলে প্রাণ যাইবার আশঙ্কাও যে ছিল না, এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। সম্ভবতঃ এই কারণেই শানাইয়ের স্থান ছিল তোরণের উপর এবং সারেঙ্গীর আসন আসরের বাহিরে। মুসলমান আমলে ঐক্যতান বা অর্কেষ্ট্রার প্রচলন ছিল না; কাজেই যন্ত্র হইতে নির্গত স্বরের উচ্চতা-সাধনের জন্য কোনরূপ চেষ্টাই হয় নাই সেই যুগে।

ইউরোপ বা আমেরিকায় ব্যবস্থা কিন্তু অন্যরূপ। ওদেশে যে ধরণের সঙ্গীত চর্চ্চা হয়, তাহাতে যান্ত্রিক শব্দের উচ্চতার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। সে দেশের সঙ্গীতের মূল ভিত্তিই এদেশ হইতে পৃথক। সেখানে ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেই সঙ্গীতের অনুরাগী এবং এজন্য তাঁহারা প্রত্যেকেই সাধ্যানুযায়ী অর্থব্যয়ও করিয়া থাকেন। এখানে যেমন সাধারণতঃ রাজা, জমিদার বা ধনীর গৃহেই সঙ্গীতের আসর বসিয়া থাকে, সেখানে সেরূপ নহে। ওদেশে সাধারণ রঙ্গালয়ে বা সঙ্গীতের জন্য বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত মিউজিক্ হলেই সকল রকম সঙ্গীতের আসর বসানো হয় এবং তাহাতে যোগদান করিতে হইলে রীতিমত দর্শনী দিতে হয়; অবশ্য আর্টিষ্টের জনপ্রিয়তা অনুসারে টিকিটের মূল্যেরও তারতম্য হইয়া থাকে। এই সমস্ত মিউজিক হলে লোক সঙ্কুলানের স্থান এদেশের যে-কোনও বড় রঙ্গালয় অপেক্ষা অনেকগুণে অধিক; যেমন নিউ ইয়র্কের "রেডিও সিটি"তে ৬৫০০ লোকের বসিবার স্থান আছে। "Roxy"-তে ৬২০০, প্যারিসের Gaumont Palace-এ ৬০০০, Cleveland [U. S. A.] "মেমোরিয়াল হলে" ১৫০০০ দর্শক বসিতে পারেন। কাজেই এই সমস্ত হলের বিস্তৃতির দিকে লক্ষ্য করিয়া উহাদের শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত যাহাতে যন্ত্রের ধ্বনি স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা সকল যন্ত্রীরই থাকে। এবং এই জন্য নিত্য নূতন পন্থা ও অভিনব যন্ত্রের আবিষ্কারের জন্য ওদেশে চেষ্টা এবং অর্থব্যয়ের অন্ত নাই।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশেও সঙ্গীতের চর্চ্চা ক্রমেই ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে গুণী সঙ্গীত-যন্ত্রীদের যন্ত্রালাপ শুনিবার জন্য সাধারণ শ্রোতার সংখ্যাও বাড়িয়াই যাইতেছে। অপর দিকে রাজা, মহারাজা জমিদার প্রভৃতির ভিতর গুণী সঙ্গীত-শিল্পীকে পালনের ইচ্ছা ও শক্তি ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে কোন যন্ত্রশিল্পী যদি নিজের গুণপনার পরিচয় দিতে চান, তাহা হইলে তাঁহার কোন রঙ্গালয় বা বড় 'পাব্লিক হলে'র শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। এবং নিজের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে সাধারণের মধ্যে সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করিবার মত প্রেরণা ও জাগাইয়া তুলিতে হইবে। ইতিমধ্যে এদেশে রঙ্গমঞ্চে বা হলে যে সমস্ত সঙ্গীতের আসর বসানো হইয়াছে, তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। এই অসাফল্যের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া যন্ত্রীরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকেন—আমাদের দেশের শ্রোতারা বেশীর ভাগই সঙ্গীত বিষয়ে অশিক্ষিত; অল্প আলাপ বাজাইতে না বাজাইতেই তাঁহারা চীৎকার ও করতালি সুরু করিয়া দেন। অপর পক্ষে শ্রোতাদিগের অভিযোগ—যন্ত্রীর যন্ত্র এমনই ক্ষীণ যে, অধিকাংশ সময়েই তাহা হইতে নির্গত আওয়াজ শ্রুতিগোচর হয় না; শুধু হাস্যকর অঙ্গ ও মুখভঙ্গী আমরা নির্ব্বিবাদে কতক্ষণ সহ্য করিব; তাহার উপর ওস্তাদজীরা এমনই ওস্তাদ যে, আমরা প্রচণ্ডভাবে আপত্তি না করিলে তাঁহারা কিছুতেই থামিতে চাহেন না।—আমি বলি যে, উভয় পক্ষের এই বিরুদ্ধ অভিযোগের আপোষ মীমাংসার সময় আসিয়াছে।

লণ্ডনের
ভড্‌ভিল-রঙ্গমঞ্চে
তিমিরবরণ

ইউরোপ বা আমেরিকার জনসাধারণ গুণীর আদর যে-ভাবে করিয়া করিয়া থাকে, আমরা তাহা ভাবিতেই পারি না এবং গুণীরাও জনসাধারণের এই আদরের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট। যাহাতে জনসাধারণের সম্মুখে তাঁহাদের সামান্যমাত্রও ত্রুটী না হইয়া পড়ে, সে বিষয়ে তাঁহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে। জনপ্রিয়তা অর্জ্জনের জন্য ওদেশের সঙ্গীতশিক্ষার্থীরা কয়েকটি জিনিষ সযত্নে অভ্যাস করিয়া থাকেন—যথা, মুদ্রাদোষবর্জ্জন, সুষ্ঠু অঙ্গ ও মুখভঙ্গী এবং সময়ের মাত্রাজ্ঞান অর্থাৎ কতক্ষণ ধরিয়া গাহিলে বা বাজাইলে শ্রোতার ধৈর্য্য পরীক্ষা করা হইবে না, সেদিকে তাঁহারা বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। অপর দিকে তাঁহারা আবার যে ধরণের শ্রোতা পান, এদেশের যন্ত্রী বা

গায়কের পক্ষে তাহা বাস্তবিকই দুর্লভ। সঙ্গীত আরম্ভ হইবার পরে শ্রোতারা নিজেদের মধ্যে চুপিচুপি কথা বলা তো দূরের কথা, ধূমপান করা বা সামান্যমাত্রও নড়াচড়া দূরে পরিহার করেন। একজন শ্রোতা যাহাতে অপর শ্রোতার সামান্যমাত্রও অসুবিধা না হয়, তাহার জন্য সবিশেষ যত্নবান থাকেন। ভাল লাগুক বা নাই লাগুক, নিঃশব্দে স্থিরভাবে নিজের আসনে বসিয়া থাকাই ওদেশের নিয়ম। যদি কেহ দেরীতে আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে আরব্ধ বিষয় শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রেক্ষাগারের বাহিরে অপেক্ষা করিতে হয়। একদিন আমি প্যারিসে একজন বিখ্যাত 'গিটার'-বাজিয়ের বাজনা শুনিতে গিয়াছিলাম। তিনি মঞ্চের উপর বাজনা সুরু করিবার পর পিছন দিক হইতে একটি মৃদু আওয়াজ উঠিয়াছিল। বাজিয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁহার যন্ত্র বন্ধ করিয়া মঞ্চের উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন; অমনি সঙ্গে সঙ্গে মৃদু রব বন্ধ হইয়া গেল, দর্শকগণ শিল্পীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর যন্ত্রী ধীরে ধীরে তাঁহার যন্ত্র তুলিয়া লইয়া পুনরায় বাজনা সুরু করিলেন। আমার মনে হয়, আমাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্রীও যদি মঞ্চের উপর হইতে এইরূপ করিতে সাহসী হন, তাহা হইলে তাঁহার সেদিনের মত বাজানো ত' বন্ধ হইয়া যাইবেই, উপরন্তু অচিরেই তাঁহাকে জনপ্রিয়তাও হারাইতে হইবে।

আমি বলি, যন্ত্রীরও যেমন শ্রোতার সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, শ্রোতার পক্ষেও সেইরূপ যন্ত্রীর প্রতি অনুরূপ কর্ত্তব্য আছে। এবং উভয় পক্ষের মধ্যে সহযোগিতাই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ 'যন্ত্র' ও সঙ্গীতের উন্নতির এবং সঙ্গীতানুরাগ-প্রবুদ্ধ জনমত গড়িয়া তুলিবার পথে সহায়ক হইবে।

সিনেমা-সাহিত্য

যাহা আমাদের নাই

[শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়]

সিনেমা বিষয়ে কিছু লিখিতে গেলেই মনে আসে আমাদের দৈন্যের কথা। অবশ্য এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেশী চিত্র যা ছিল, বর্ত্তমানে তাহার উন্নতি হইয়াছে শতগুণ। মনে আছে, বহুকাল পূর্ব্বে যখন দেশী ছবি প্রথম দেখি। চিত্রখানি কমিক চিত্র। চিত্রখানি দেখিয়া হাসিয়াছিলাম সত্যই; কিন্তু চিত্রের comic element-এর জন্য নহে, ছবিখানির লোক হাসাইবার ব্যর্থ চেষ্টা দেখিয়া। "নির্ব্বাক" যুগে ছবির সঙ্গে বাদ্য বাজান হইত। যে কমিক ছবিখানির কথা বলিলাম, তাহার এক যায়গায়—যেখানে প্রযোজকের মতে ছবির climax অর্থাৎ comic element জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে, সেইখানে—বাদ্যে বাজিতেছে—"এমন চাঁদের আলো ......ইত্যাদি"। এই সকল দেখিয়া সেইদিন হাসিয়াছিলাম। এখন আর সে অবস্থা নাই। ছবি তুলিবার পূর্ব্বে অনেক ভাবিয়া চিন্তা করিয়া কাজে হাত দেওয়া হয়। যা-তা জিনিষের চলনও বাজারে বহু পরিমাণে কমিয়া আসিতেছে। আমি বাংলা সবাক চিত্রের কথা বলিতেছি। লোকে এখন বাংলা ছবি দেখিবার জন্য যথেষ্টই পয়সা খরচ করে। দেখিতেও ভালবাসে। উৎকৃষ্ট ইংরেজী সবাক ছবি দেখিতে লোকের যে উৎসাহ, বাংলা ছবি দেখিতে উৎসাহ তাহা অপেক্ষা বহুগুণে বেশী। এক একখানি ছবির ১২ হইতে ৩২ সপ্তাহ পর্য্যন্ত একই হাউসে একটানা প্রদর্শনই তাহার প্রমাণ দেয়। কিন্তু ইহাতে দেশী ছবির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। দেশের শতকরা ৯২ জন লোক ইংরেজি জানে না, কাজেই ইংরেজি সবাকে তাহাদের আনন্দ অর্দ্ধেক মারা যায়। দেশী ছবি, দেশী গল্প তাহারা বুঝিতে পারে। কাজেই আবালবৃদ্ধবণিতার ভীড় হয় দেশী ছবিতেই বেশী। ব্যবসা করিতে বসিয়া 'art' দেখিতে গেলে চলে না। Art-এ যদি পয়সা আসিত, তাহা হইলে আপত্তি ছিল না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, art-এ পয়সা নাই। কাজেই, হাউসওয়ালাদের দেশী ছবি দেখাইতেই হইবে। ইহাতে পয়সাও হয় বেশী—এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীয়ানাও করা হয়। দেশের বহু পয়সা, পূর্ব্বে যাহা বিদেশে যাইত তাহা—দেশেই থাকিয়া যায়। এবং ইহাতে দূর ভবিষ্যতে দেশী ছবির উন্নতি হইবারও আশা আছে। বর্ত্তমানে দেশী ছবি নামে কাটে। কিন্তু এমন দিন আসিবে, যখন দেশী ছবি শুধু নামেই কাটিবে না; ধারেও অর্থাৎ quality-র দ্বারা কাটাইতে হইবে। উপরন্তু ছবির প্রচারের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে publicity প্রয়োজন হইবে।

দুঃখের বিষয়, দেশে এখনও সিনেমা-সাহিত্য বলিয়া কিছু গড়িয়া উঠে নাই; অথচ ইহার প্রয়োজন অত্যন্ত অনুভব করি। ইংরেজি Campaign book, যাহা প্রত্যেক ছবির সঙ্গে পাওয়া যায়—দেশী ছবির বেলায় সেই প্রকার কিছু থাকে না। হাউসের কর্ত্তা এক রকম করিয়া কাজ চালাইয়া লন। কিন্তু ইংরেজী, বিশেষ করিয়া মার্কিন দেশের ছবির গুণাগুণ বর্ণনা করিতে যে প্রকার ভাষা ব্যবহৃত হয়, বাংলায় তাহার প্রতিভাষা পাই না। এদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। যে সকল সাহিত্যিক সিনেমার বিরুদ্ধে কলম ধরিয়াছেন (নিজেদের ব্যক্তিগত চরিত্রের কথা ভুলিয়া গিয়া), তাঁহারা এই দিকে মন দিলে কিছু উপকার হয়। এই বিষয়ে পূর্ব্বেও

বলিয়াছি; কিন্তু কাহারও নিকট হইতে কোন সাড়া পাই নাই। বর্ত্তমানে সিনেমা-পাব্লিসিটি করিতে গিয়া ভাষার দৈন্য বিশেষ করিয়া অনুভব করি। ইংরেজীর নকল করিতে লজ্জা পাই, অথচ অন্য পথ নাই। বলিতে লজ্জা হয়—বাংলা, হিন্দী বা উর্দ্দু সবাক চিত্রের বিজ্ঞাপন, পোষ্টার ইত্যাদি আমরা চুরি-চামারি করিয়া ইংরেজী ভাষায় যেমনটী লিখিতে পারি, দেশী ভাষায় তেমন পারি না। কোন রকমে ঢোক গিলিয়া বহুজনব্যবহৃত কয়েকটি কথা দ্বারা কোন রকমে কাজ সারি। যাহা লিখিলাম, তাহা যে 'ঠিক' হইল না, যাহা বলিলাম—তাহাতে যাহা বলিতে চাই, তাহার হয়ত কিছুই বলা হইল না,—ইহা মনে মনে বুঝিতে পারিয়াও অনুপায় হইয়া বসিয়া থাকি।

আমাদের দেশের সকল প্রতিষ্ঠানের মত সিনেমা প্রতিষ্ঠানেও বহু দোষ আছে, স্বীকার করি; কিন্তু তাহার প্রতীকার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া হইবে না। যাহা মন্দ তাহা দেখাইয়া দাও—কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বল যে, উন্নতির পথ কোন্ দিকে। বর্ত্তমানে সিনেমা-ব্যবসায় দেশের একটি প্রধান শিল্প। কত কোটি টাকা ইহাতে খাটিতেছে, তাহা অনেকেই জানেন না; কত লক্ষ লোক এই ব্যবসায়ে লিপ্ত, তাহার খবরও কেউ রাখেন না। এই ব্যবসাকে ভাঙ্গিবার চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। উন্নতি করার চেষ্টাকে নমস্কার করিব। শিল্পটীকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার পথ দেখাও, দেশের উপকার হইবে।

আমার কথা

(শ্রীরাইচাঁদ বড়াল]

ভাই পশুপতি,

তুমি তাগাদা দিচ্ছ—আমায় লেখা দিতে হবে। কিন্তু তোমার পক্ষে লেখা চাওয়াটা যতখানি সহজ, আমার পক্ষে লেখা দেওয়াটা ঠিক ততখানি সহজ নয়। কারণ কথা বিনিয়ে বিনিয়ে বলা আমার অভ্যাস নয়, তোড়-জোড় ক'রে লিখ্তে ব'স্লেই আমার ভাব সব উবে যায়, মনে হয় যেন সময়টা বাজে নষ্ট হোলো। লেখার বদলে যদি চার্টি স্বর-রচনা ক'র্তে ব'ল্তে, তা'হ'লে আমি লাখ লাখ খুসি হতুম। তবুও অনুরোধ এড়ানো বড়ই কঠিন, কাজেই কিছু লিখতেই হবে।

যা' সোজা ও সরল আমি তাই ভালো বুঝি। তাই চলমান ভাষা-মুখর চিত্রের উপযোগী ক'রে যে সঙ্গীত রচনা ক'র্তে চেষ্টা করি, তা' যাতে সরল সুন্দর হয়, ভাবের সঙ্গে যা'তে তা'র পরিণয় ঘটে—সেইদিকেই আমার লক্ষ্য থাকে। মানুষ সহজভাবে কোনো কথা ব'ল্লে যেমন বুঝতে কষ্ট হয় না, বক্তব্য বিষয়টি সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, সেইরূপ চৌষট্টি ললিত-কলার শ্রেষ্ঠ কলা সঙ্গীতের পূর্ণ অভিব্যক্তি করা যায়—প্রকাশের সরল-ভঙ্গীতে।—সে-ভঙ্গীর কোনো বাঁধাবাঁধি নিয়ম নেই;—মাত্র প্রয়োজন যে, ভাবের আনুগত্য স্বীকার ক'র্বে সঙ্গীত এবং ভাবাশ্রিত প্রকাশ-ভঙ্গীতে বিরাজ ক'র্বে সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য।—বাহ্য-আড়ম্বরে কখনো সঙ্গীতের সত্য-রূপ ফুটে ওঠে না। যা' সত্য—তা' সব সময়েই সরল—তা' বিরল-ভূষণ, তা'র অলঙ্কারের বাহুল্য নেই।—

মানুষের প্রতিদিনকার জীবনটা বিশ্লেষণ ক'রে যদি দেখা যায়—আমরা প্রথমে দু'টি বস্তুর সন্ধান পাবো—তা'র অন্দরমহল ও বাহির-মহল। বাহির-মহল—দৈনন্দিন জীবনে যে-সকল ঘটনা ঘটে; মোটামুটি ধর্লে খাওয়া, পরা, কাজ-করা ঘুমানো প্রভৃতি—তা'র ভিতর বেশী-কিছু আড়ম্বর নেই; অন্দর-মহল—জীবনের যে ভাব—তা'র সুখ, দুঃখ-বেদনা, মিলন-বিরহ প্রভৃতি—কৃত্রিম মুখোস কখনো প'রে থাকে না।—যদি প্রতিদিনের এই জীবন-কাহিনী অবলম্বন ক'রে সঙ্গীত প্রকাশ ক'র্তে হয়, তা'হ'লে—আমাকে সর্ব্বাগ্রে জান্তে হবে, মানুষের বাহির-জগৎ ও মনোজগতের সত্য-ইতিহাস। তারপর সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সমস্ত জিনিষটা ফুটিয়ে তুল্তে হ'লে—আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত একটা রেখা-চিত্র (Diagram of music) এঁকে নিতে হবে, তবেই মানুষের জীবন-কাহিনীর সত্য-রূপ প্রকাশ ক'র্তে সঙ্গীত সফল হবে।—সঙ্গীতকে রূপ-লীলায়িত করার কোনো নির্দ্দিষ্ট পথ নেই। মানুষের অন্তরের ভাবকে পরিস্ফুট ক'র্তে হ'লে কতকগুলি বাঁধা রীতি অনুসরণ ক'র্লে চ'ল্বে না। দৃষ্টান্ত ধরা যাক্—করুণ-রস। এখন করুণ-রস ফুটিয়ে তুল্তে হ'লে দু'চারটে রাগ-রাগিণীর দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা-পাত্র নিয়ে দাঁড়াতেই হবে,—কিন্তু সঙ্গীত-রচনার সময় লক্ষ্য ক'র্বার প্রধান বিষয় এই যে, করুণ ভাবটি কি অবস্থায় প্রকাশিত হ'চ্চে।—বিরহ-বিধুরার বিচ্ছেদ-বেদনা হ'তে পারে, পুত্র-শোকাতুরা জননীর মর্ম্মন্তুদ দুঃখ হ'তে পারে, পতি-বিয়োগ-কাতরা রমণীর বিলাপ-ক্রন্দন হ'তে পারে,—এই প্রকারের বিভিন্ন মনোভাব রূপান্তরিত ক'র্তে হ'লে—করুণ-রসেরই সৃষ্টি ক'র্তে হয়, কিন্তু প্রকাশ-ভঙ্গী ভাবগত এবং অবস্থানুযায়ী হওয়া নিতান্ত দরকার। এই রকম স্থলে ভাবকে ফুটিয়ে তোল্বার জন্যে ইচ্ছামত রাগ-রাগিণীর মিশ্রণ ক'র্লে—মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। ভাবটাকেই প্রধান ক'র্তে হবে—কারণ সঙ্গীতের নিজস্ব রূপ থাক্লেও—এস্থলে সঙ্গীত পরাশ্রিত, ভাবের সম্পূর্ণ অধীন, অথচ আপন গৌরবে গৌরবান্বিত। এই সঙ্গীতই ভাবের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে। যদি ভাবকে তুচ্ছ ক'রে—বিজ্ঞানকেই বড় ক'রে তুলি—আমার সেখানে সকল প্রয়াস ব্যর্থ।—

আমি গানে বা ছায়াচিত্রের গল্পে স্বর-রচনা করি—গানের ভাব কিংবা ঘটনার আবহাওয়াকে মেনে নিয়ে।—প্রসঙ্গক্রমে আর একটা কথা বলা দরকার মনে করি। অনেকেই বলেন—অর্কেষ্ট্রা-জিনিসটার অস্তিত্ব আমাদের দেশে কোনদিনই ছিল না। অবশ্য "অর্কেষ্ট্রা" শব্দটা যে বিদেশী—তা' আমি স্বীকার ক'রে নিচ্ছি, কিন্তু এর অস্তিত্ব ছিল না—এ-কথা মেনে নিতে পার্লুম না। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস যাঁরা জানেন—যখন আমাদের দেশে সঙ্গীত ও নাট্যাভিনয়ের গৌরবের দিন ছিল—সে-দিনের খবর যাঁরা ভরত-মুনির নাট্যশাস্ত্র ও অন্যান্য ঐ বিষয়ক গ্রন্থে প'ড়েছেন—তাঁরা সকলেই স্বীকার ক'র্বেন যে, আমাদের নানাবিধ বাদ্য-যন্ত্র ছিল এবং এই সকল বাদ্য যন্ত্রের সমন্বয়ে ঐক্‌তান-বাদনেরও প্রচলন ছিল। ধাতু নির্ম্মিত বাজ্নাকে বলা হ'য়েছে "ঘন",—"বিতত" বা "অবনদ্ধ" চাম্ড়ার বাজ্নাকে, তারের যন্ত্রকে "তত", এবং হাওয়ার যন্ত্রকে "শুষির"।—একসঙ্গে অভিহিত করা হয়—"বাদ্যভাণ্ড"।—এই চারপ্রকারের যন্ত্রের সম্মেলনে ঐক্যতান যন্ত্র-সঙ্গীত হোতো।—এখন অনেক বাদ্য-যন্ত্র অপ্রচলিত বা লুপ্ত, তাই বিদেশী যন্ত্র ব্যবহার ক'র্তে আমাদের বাধ্য হ'তে হয়। আমার এ-সংস্কার নেই যে, বিদেশী যন্ত্র ব'লে তা' গ্রহণ ক'র্বো না।—অবশ্য গ্রহণ ক'র্বো সেই সকল যন্ত্রকে আমাদের কার্য্যোপযোগী ক'রে নিয়ে। এইটুকু বিশেষভাবে বলা যেতে পারে যে, যখনই আমরা কোন যন্ত্র ব্যবহার করব, তখন শুধুমাত্র আমাদের দেখতে হবে—আমাদের সঙ্গীতের জাতীয়-চরিত্র যেন খর্ব্ব না হয়।

আমার বক্তব্য এই পত্রে আর বিস্তারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। হয়তো বাজে ব'কেই গেলুম। সবশেষে বলি, যে-বস্তুটিকে আমরা বাঙালী—পুনরুজ্জীবিত ক'র্তে চেষ্টা করছি—তা'র প্রকৃত সন্ধান এখনো মেলে নি। কেউই যখন এ-প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর এখনো পর্য্যন্ত দিতে পারেন নি, তখন আর বৃথা বাক্‌জালের সৃষ্টি না ক'রে—এইখানেই ইতি ক'র্‌ছি।

আধুনিক বাংলা গান

[শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে]

শ্রীযুক্ত পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

সমীপে—

বন্ধুবরেষু—

বাংলা গানের সম্বন্ধে কিছু লিখতে বলেছেন। অযোগ্যের প্রতি কেন যে এই জুলুম বুঝতে পারলুম না—বোধ হয় এটা ভালোবাসার দাবী!

গানের মূল উদ্দেশ্য হ'চ্ছে অভিব্যক্তি। গানের কথায় যে-ভাবটি আমাদের মনে আসে, সুরের রঙে তাকে প্রাঞ্জল ক'রে তোলাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আর সেই উদ্দেশ্য যখন সফল হয়, তখনই গান গাওয়া হয় সার্থক। অবশ্য গানের প্রসঙ্গ তুলতে গেলে একথা প্রথমেই মেনে নিতে হবে যে, সুর-বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলবার উদ্দেশ্যেই এই ললিতকলা। সুতরাং সুরের প্রাধান্য এখানে স্বীকার ক'রে নিতে হবে। সুরের প্রাধান্য বলবার কারণ এই যে, আমরা যখন কোন

"ম্যান্ অব্ টু ওয়ারল্ড্স্"-চিত্রে
এলিস্সা ল্যাণ্ডি

কবিতা আবৃত্তি করি, তখন তা'তেও একটা সুর থাকে। শুধু কবিতা আবৃত্তি কেন, আমরা যখনই কোন কথা কই, তখনই আমাদের একটা না একটা সুরের আশ্রয় নিতেই হয়,—কারণ মনের অনুভূতিকে বাদ দিয়ে কথা বলা চলে না—কথাগুলির সাথে সেই অনুভূতি-প্রকাশক সুরকে জড়িয়ে থাকতেই হয়।

যে কথায় emotion নেই, তাকে সহজে বোঝা যায় না। আমাদের বিভিন্ন emotion বিভিন্ন সুরে প্রকাশ পেয়ে থাকে। এই সুরের গুণেই আমরা অপরের মনোজগতের সুখদুঃখের সাড়া পাই। সুর বাদ দিয়ে গান গাওয়া যায়না এবং সুরের ভিতর দিয়েই গানের প্রকাশ; তাই আমাকে এত কথা বলতে হ'ল। কবিতা আবৃত্তি করতে যে সুরের প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক বেশী ক'রে সুরের প্রয়োজন হয় গান গাইবার বেলা। কিন্তু দেখতে হবে, গান গাইতে গিয়ে এই সুরের প্রাধান্য যেন বাহুল্যে গিয়ে না ঠেকে। কথার বাঁধুনি সুরের বন্যায় যেন ভেসে না যায়। আমার মতে কণ্ঠ-সঙ্গীতে কথা উপেক্ষা করলে একেবারেই চলবে না। এমন ভাবে গান গাইতে হবে যাতে কথাও বাঁচে, অথচ সুরও সুন্দর হ'য়ে ফুটে ওঠে। কথা আর সুরের মিতালিতেই গানের প্রকৃত রূপ ফুটে উঠবে। কোন দিক থেকে কোনটাই যেন বাহুল্যে গিয়ে না দাঁড়ায়। ছবির চেয়ে ছবির পৃষ্ঠ-পট (back-ground) যদি জমকালো হয়, তা'হলে যেমন রসানুভূতির ব্যাঘাত ঘটে, তেমনি গানের কথা আর সুরে যদি সমন্বয় (blending) না হয়, তাহ'লেও সত্যিকারের সঙ্গীত-রস-সৃষ্টি হ'তে পারে না। আর একটি বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রতিকূল সুরের বিপাকে প'ড়ে আমাদের গানের ভাব বা ভাষা যেন ব্যর্থ হ'য়ে না যায়। আজকাল এই রকম ভাব বা ভাষা-বিরুদ্ধ সুরবিশিষ্ট গান অনেকই শুনি, আর মনে হয়—হায় রে! কান্নার সুরে কি কখনও হাসা যায়! এই প্রসঙ্গে ছোটবেলার একটা কথা মনে হচ্ছে—সেদিন উড়ে-যাত্রা শুনতে গিয়েছিলুম। পালা ছিল "রাম-সীতার বনবাস"—লোকে মুহ্যমান! দশরথ মৃত্যু-শয্যা থেকে উঠে একবাজি তাণ্ডব নেচে নিলেন; তারপরে যাত্রার আসরে নাচতে নাচতে ইহলীলা সংবরণ করলেন, আমরাও বাঁচলুম। আজও সেকথা মনে হ'লে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধ'রে যায়। কিন্তু আজকের দিনে উদ্ভট সুরবিশিষ্ট গান শুনে মনে হয়, জগতে এ-রকম সোণার পাথরবাটীর দৃশ্য খুব বেশী বিরল নয়। খুব একটি দুঃখের গান শুনছি—যার প্রত্যেকটি কথায় বিরহ বেদনা উপচে পড়ছে, কিন্তু সুরটি তার নিছক হাল্কা ও চটুল উল্লাসের আভাসে ভরা। তেমনি আশে পাশে শুনছি, অশ্রুবিগলিত সুরে আনন্দ-উৎসবের গান।

বাংলা ভাষায় ঠুংরী গান এনেছি ব'লে অনেকে আমাকে প্রশংসা বা কেউ কেউ বাক্যবাণে বিদ্ধ ক'রে থাকেন। যাঁরা আমার প্রচেষ্টাকে প্রশংসার চক্ষে দেখেন, তাঁদের শুভেচ্ছাকে আশীর্ব্বাদের মত মাথা পেতে নি এবং এইটুকুই আমার চরম লাভ। আর যাঁরা আমার প্রচেষ্টাকে সহ্য ক'রতে পারেন নি, তাঁদের কাছে আমার এই নিবেদন যে, কোনদিন আমি গানের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ গানের নিহিত ভাবধারাকে গানের সুরের দ্বারা ব্যাহত করিনি। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী প্রভৃতি সঙ্গীতাঙ্গকে আমি শুধু গানের ভাবধারার বাহন ব'লেই স্বীকার করি, তার বেশী নয়। কবি গানের কথার ভিতর দিয়ে যে অনুভূতি বা ভাবকে প্রকাশ ক'রতে চাইছেন, তাকেই সম্যক্‌ভাবে পরিস্ফুট করা গানের একমাত্র উদ্দেশ্য। যাঁরা আমার নির্দ্দেশকে মেনে তাঁদের ভাবধারাকে প্রকাশ করবার জন্য ঠুংরী শ্রেণীকে বাংলা গানের বাহনরূপে ব্যবহার করেছেন, তারাই আমার হৃদয়ের সত্যকে উপলব্ধি করেছেন।

আর যাঁরা শুধু সুরের বিচিত্র জালে আপনাকে জড়িয়ে ফেলেছেন, তাঁরা গানের অন্তরতম যে-ভাব, তা'র দিকে ফিরেও তাকান নি। তাই তাঁদের কাছে সুরের কারসাজির পরিচয়ই আমরা পেয়েছি, কোন অনুভূতির ছাপ আমাদের মনে লাগেনি। গান গাইতে হ'লে একটা প্রাণের তাগিদ চাই, সঙ্গীত শুধুমাত্র একটা সুরের বিলাস নয়। আরো চাই শক্তিমত কাব্য-বিচার। এই বিচার-শক্তির অভাব হ'লে যত বড় মিষ্টি গলাই হোক্ না কেন, যত অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যই থাকুক না কেন, তবু গান চিত্তকে স্পর্শ করে না, গানের মূল উদ্দেশ্য হ'য়ে যায় ব্যর্থ। চলতি পথে সেদিন শুনছিলাম, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সেই গান

রঙ্‌মহল—   অক্টোবর মাসের কার্য্যসূচী—

	সোমবার		মঙ্গলবার		বুধবার		বৃহস্পতিবার		শুক্রবার		শনিবার		রবিবার
১লা	×	২রা	×	৩রা	পতিব্রতা রাত্রি ৭ টায়	৪ঠা	×	৫ই	×	৬ই	কাজ্‌রী রাত্রি ৭ টায়	৭ই	বাঙ্‌লার মেয়ে বৈকাল ৪ টায়
৮ই	মহানিশা বৈকাল ৪ টায়	৯ই	×	১০ই	পতিব্রতা রাত্রি ৭ টায়	১১ই	×	১২ই	×	১৩ই	কাজ্‌রী রাত্রি ৭ টায়	১৪ই	বাঙ্‌লার মেয়ে বৈকাল ৪ টায়
১৫ই	বাঙ্‌লার মেয়ে বৈকাল ৪ টায়	১৬ই	কাজ্‌রী ও মহানিশা রাত্রি ৮॥ টায়	১৭ই		১৮ই	মহানিশা বৈকাল ৪ টায়	১৯শে	×	২০শে	কাজ্‌রী রাত্রি ৭ টায়	২১শে	বাঙ্‌লার মেয়ে বৈকাল ৪ টায়
২২শে	মহানিশা ও পতিব্রতা রাত্রি ৭ টায়	২৩শে	বাঙ্‌লার মেয়ে বৈকাল ৪ টায়	২৪শে	পতিব্রতা রাত্রি ৭ টায়	২৫শে	×	২৬শে	×	২৭শে	কাজ্‌রী রাত্রি ৭ টায়	২৮শে	বাঙ্‌লার মেয়ে বৈকাল ৪ টায়
২৯শে	×	৩০শে	×	৩১শে	×		*		*		*		*

"আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে"—গায়ক সুকণ্ঠে সাধ্যমত সুরের কেরামতি দেখিয়ে যাচ্ছেন ; কিন্তু কবির কথার অন্তরালে যে কি বিরাট অনুভূতি রয়েছে, তার পরিচয় তিনি পান নি ; তাই তাঁর গানও ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

আপনার অনুযোগ বাংলা ভাষায় খেয়াল গান ভাল হয় না কেন? অবশ্য আমরা অনেকেই বাংলাতে খেয়াল শ্রেণীর গান গাইবার চেষ্টা করছি, কিন্তু পরিণতির দিক দিয়ে তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যায় নি। আমার মনে হয়, শিক্ষকদের কাছ থেকে আমরা এই শ্রেণীর গান যা পেয়েছি, সুরের অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য ও লয়ের কারসাজির চাপে তার ভিতরকার মূল ভাবধারা কখনই মুক্তিলাভ করতে পারে না। ভাব-প্রবণ বাঙ্গালী তাই এই শ্রেণীর বাংলা গানে বিশেষ ক'রে আনন্দলাভ কোরতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের একটী গানকে উদাহরণ স্বরূপ ধ'রে নেওয়া যাক্।

আমার সকল কাঁটা ধন্য ক'রে
ফুট্‌বে গো ফুল ফুটবে
আমার সকল ব্যথা রঙ্গিন হ'য়ে
গোলাপ হয়ে উঠ্‌বে।

রবীন্দ্রনাথের সত্যিকারের সুর বাদ দিয়ে এই গানকে যদি খেয়াল পর্য্যায়ভুক্ত করি, তাহ'লে মিড়্, গমক, গিট্‌কিরি, হলকৃতানে অলঙ্কৃত হ'য়ে লয়ের কারসাজি এবং তেহাইয়ের ধাক্কাতে এই গান যে রূপ ধারণ করবে, তা আর যাই করুক না কেন, সত্যিকারের রসসৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না—কারণ অলঙ্কারের চাপে এর ভাবধারা হয়ে যাবে প্রচ্ছন্ন। অঙ্গের সৌষ্ঠবের জন্যই অলঙ্কার—কিন্তু অলঙ্কারের চাপে যদি অঙ্গের অস্তিত্ব বিলোপ পায়, তাহ'লে অঙ্গ ও অলঙ্কার দুইই হয় ব্যর্থ। মোট কথা এই কথাই আমি স্পষ্ট ক'রে বলতে চাই যে, যে-গানে ভাবধারা ব্যাহত হয়, তাকে আমি সঙ্গীতকলার পর্যায়ভুক্ত করতে নারাজ। অবশ্য বাংলার উপযোগী ক'রে খেয়ালকে আনবার চেষ্টা যে হচ্ছে না, তাও নয় ; তবে এই মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন ক'রতে হ'লে কতকগুলি গোঁড়ামি ছেঁটে ফেলতে হবে। খেয়াল গান যাতে আমরা বাঙালীর কান বা প্রাণ নিয়ে শুনতে পারি, এমনি একটা কিছু ক'রতে হবে। যাঁরা ওস্তাদ-পন্থী তাঁরা কঠিনভাবে রক্ষণশীল, তাই সহজে কিছু হ'য়ে উঠছে না। যা' পুরাণো, তাকে নিছক অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার পক্ষপাতী আমি নই। তবে পুরাতনের প্রতি আমার অসীম শ্রদ্ধাও আছে। যাঁরা এই পুরাতন দুর্লভ বিদ্যাকে রক্ষা ক'রে আসছেন, সেই ওস্তাদ-শ্রেণী আমার নমস্য। কিন্তু যে-বিদ্যা গচ্ছিত রয়েছে, তাকে হ্রাস হ'তে না দেওয়াও যেমন ধর্ম্ম, তাকে সমৃদ্ধ করাও তেমনি ধর্ম্ম হওয়া উচিত। বিশেষ ক'রে মানুষের মন যখন কালের প্রভাবে পরিবর্ত্তনশীল, তখন সেই মনের তৃষ্ণাকে মেটাবার জন্যেই পুরাতনের সঙ্গে সঙ্গে নূতনের সংযোগ থাকা আবশ্যক। চিত্র-শিল্প, ভাস্কর্য্য, কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি পুরাতন যুগের ললিতকলাগুলি কি যুগের পর যুগ ধ'রে মানুষকে শুধু নকল-নবীশের কর্ম্মেই দীক্ষিত কোরবে? বর্ত্তমান যুগের স্বপ্নে কি এদের সমৃদ্ধ করবার কিছুই নেই? মানুষের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে। আপনার কথামত আজ যদি বাঙালী খেয়াল শুনতে চান, তাকে বাঙালীর কান, বাঙালীর রুচি নিয়েই তা শুন্‌তে হবে।

কাপ্তেন ধরিবার ফাঁদ

[শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল]

স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্রের যুগ হইতে কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত থিয়েটারের ব্যবসা চালাইতে হইলে কাপ্তেন ধরিবার প্রয়োজন ঘটিত। কাপ্তেন ধরিবার প্রথা এখনও বর্ত্তমান ; তবে পূর্ব্বের মত অতটা প্রকাশ্যে নয়।

স্বর্গীয় নট ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রথম-জীবনে এই থিয়েটারের আওতায় আসিয়া কাপ্তেন-শ্রেণীর জীব-বিশেষের যে পরিচয় পাইয়াছিলেন, উত্তরকালে তাহাই তাঁহার শেষ বয়সের রচনা "রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর"-নামক উপাদেয় গ্রন্থে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। অপরেশচন্দ্রের ভাষায় 'কাপ্তেন'-এর বর্ণনা শুনুন : "আড্ডায় শুনিলাম, জাহাজের কাপ্তেন ছাড়াও স্থল-পথেরও একরকম কাপ্তেন আছে ; তাহারা জলে জাহাজের পরিবর্ত্তে সংসারে স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে জলে ভাসায়, বাপের বিষয় হ্যাণ্ডনোট কাটিয়া ওড়ায়, ঘো সাহেব পোষে, মদ খায়, বেশ্যা রাখে। আর ইহাদেরই দুই একটা কাৎলা কখন কখন থিয়েটার করে ; সুতরাং থিয়েটার করিতে গেলেই এমনি একজন 'কাপ্তেন' আবশ্যক হয়।" নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "থিয়েটারের গুপ্ত কথা" এবং অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা, রঙ্গালয় সম্পর্কিত বহু রস-রচনা ও প্রবন্ধে আমরা এই শ্রেণীর একাধিক কাপ্তেনের কাল্পনিক এবং বাস্তব—উভয় প্রকার চিত্রই প্রতিফলিত হইতে দেখিয়াছি। ইহারা সকলেই স্থলপথের কাপ্তেন; থিয়েটারের ব্যবসা চালাইবার ছুতা করিয়া অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন। এই পথের কাপ্তেনরা চিরটা কালই ঘায়েল হইয়া থাকেন এবং আজ পর্য্যন্ত কাল্পনিক ও বাস্তব—সবগুলি চিত্রেই শেষ পর্য্যন্ত 'কাপ্তেন ঘায়েল'-এর শোচনীয় পরিণাম-ই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বিগত গিরিশ-যুগে স্বর্গীয় গুর্ম্মুখ রায়, প্রতাপ জহুরী ইত্যাদির মত অনেকগুলি কাপ্তেন-ঘায়েল-এর কাহিনী বাঙলার সাধারণ রঙ্গালয়ের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সেই যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানের নবযুগ পর্য্যন্ত রঙ্গালয়ের ব্যবসাতে কাপ্তেনদের আনাগোনা এবং তাহাদের আবির্ভাব ও পতনের কাহিনী সমানভাবেই চলিয়া আসিতেছে।

বাঙলার মাটিতে ফিল্ম-ব্যবসার প্রবর্ত্তন এবং তাহার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কাপ্তেন আসিয়া জুটিয়াছিল। এইভাবে, রঙ্গালয়ের দেখাদেখি, সিনেমা-লাইনেও কাপ্তেন আবির্ভাবের অভাব মেটে নাই। রঙ্গালয়ের কাপ্তেন এবং সিনেমার কাপ্তেন—একই জাতীয়। বিদ্যার নামে অবিদ্যার চর্চ্চাতেই তাহারাও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাঙলার সাধারণ রঙ্গালয়ে নবযুগের ছোঁয়াচ লাগিতেই কয়েকটি কোম্পানী যৌথ-প্রতিষ্ঠানরূপে আত্মপ্রকাশ করে। নির্দ্দিষ্ট কাপ্তেন বা 'ধনী'র উপর নির্ভর না করিয়া, সভ্যদের মধ্যে বা সাধারণের নিকট সেয়ার বিক্রয় করিয়া, নূতন ধারায় ব্যবসা প্রবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়। কিন্তু যাহারা ভিতরের খবর জানেন, তাঁহাদের এ রহস্য অবিদিত নাই যে, ইহার দ্বারা কাপ্তেন-পর্ব্বের উচ্ছেদ ঘটে নাই। মূলতঃ এই শ্রেণীর কয়েকটি প্রতিষ্ঠান যৌথ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ায় একক কাপ্তেনের পরিবর্ত্তে বহু কাপ্তেনের মধ্যে ব্যবসায়ের 'risk' বা 'liablity' বিভক্ত হইয়া যায়। দুঃখের বিষয়, সব কয়টি যৌথ-প্রতিষ্ঠানই ঘায়েল হইয়াছে—কেবল কাপ্তেন কয়টি আইনের সুযোগ লইয়া সামান্য কিছু আক্কেল-সেলামী দিয়াই মুক্তিলাভ করিয়াছে।

মোট কথা, কাপ্তেন পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে এবং বোধ করি, ভবিষ্যতেও থাকিবে। চিত্র-জগতে এবং মঞ্চ-জগতে—উভয়-ক্ষেত্রেই কাপ্তেনের আনাগোনা সমানভাবেই চলিতেছে এবং যতদিন না ব্যবসার ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন Organization এবং নূতন নিয়ম-কানুন প্রবর্ত্তিত হয়, ততদিন অল্প-বিস্তর উভয়-ক্ষেত্রেই কাপ্তেন-শ্রেণীর বিলোপ ও আবির্ভাব চক্রবৎ চলিতে থাকিবে। সম্প্রতি ফিল্ম ও থিয়েটারের ব্যবসা কতকটা সুনিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে সত্য। তথাপি Organization-এর বনিয়াদ পাকা না হইলে কাপ্তেন-পর্ব্বের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ-সাধন সম্ভবপর হইবে বলিয়া মনে হয় না।

—
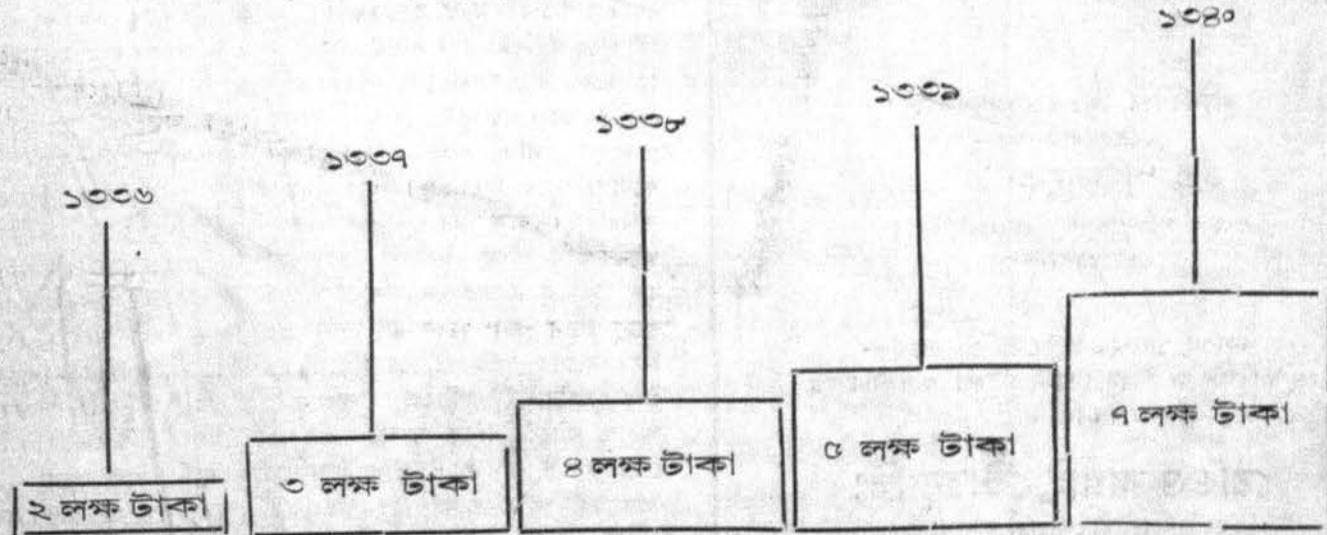
কেমন ক'রে ফ্র্যাঙ্ক্ বাক্ বন্য জন্তু ধরেন

(রেজিনাল্ড্ আরমার—প্রধান কর্ম্মসচিব আর-কে-ও রেডিও পিকচার্স কলিঃ)

এসিয়ার বন-জঙ্গলে ঘুরে ফ্র্যাঙ্ক্ ব্যাক্ যে-ছবিটা তুলেছেন, তার নাম হচ্ছে "ওয়াইল্ড্ কারগো"। হলিউডে সাধারণতঃ ছবি তোলবার জন্যে যত-খানি ফিল্ম খরচা হয়, তার চেয়ে ঢের বেশী ফিল্ম খরচা হয়েছে এই ছবিতে। ফ্র্যাঙ্ক বাককে সদা-সর্ব্বদা অনুসরণ ক'রে দু'টি ছায়াচিত্র-শিল্পী এক লাখ্ ফিটের চেয়েও বেশী ছবি তুলেছেন!

সুমাত্রা, সিংহল, ভারতবর্ষ এবং মালয়ের সব বন-জঙ্গলেই ফ্র্যাঙ্ক বাক্ ঘুরেছেন। দু-দুবার তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়েছে সাপের সঙ্গে; হিংস্র কুটিল বাঘ, চিতাবাঘ ও নেক্ড়ে বাঘেদের সামনাসামনি হয়ে জ্যান্ত ধরতে হয়েছে—অদ্ভুত উপায়ে জীবনকে নিয়ে খেলা করতে হয়েছে।

সুমাত্রা থেকে তিনি এক প্রকাণ্ড ওরাং-ওটাং ধ'রে অক্ষত অবস্থায় লং আইল্যাণ্ডে পাঠিয়েছেন; সেখান থেকে সে-জন্তুটি যাবে সেণ্ট্ লুই পশুশালায়। এই বন্য জন্তুটিকে ধরবার জন্যে তাঁকে বিস্তর পরিশ্রম করতে হয়েছে। কি-রকমে একে তিনি ধরেছেন, সে সম্বন্ধে দু'চার কথা বলছি।

অনেকদিন জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার পর একটা গাছেতে তিনি এই জন্তুটিকে দেখ্তে পান। তিনি তাঁর জঙ্গ্লী-সহচরদের এই গাছের তলায় জাল পাততে বললেন। তারপর এই জন্তুটি যে ডালে বসেছিল, তার তলাকার একটা ডালকে লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়তে আরম্ভ করলেন গুলি—যাতে ক'রে ওরাং-ওটাংটি নীচে জালের উপর লাফ দেয়। কিন্তু ওরাং-ওটাংটির মস্তিষ্ক ব'লে একটা জিনিষ ছিল। বাকের গুলি ছোঁড়া সুরু হ'তেই জন্তুটি অত্যন্ত উপেক্ষা ভরে ছুটো ডাল ধ'রে এমনভাবে দুল্তে আরম্ভ করলে যে, তিরিশটা গুলি তার গায়ের একটা লোমকেও ছুঁতে পারলে না। এদিকে তার রাগও বেড়ে উঠল। একটা গুলি-লাগা আধভাঙা ডাল সে ছুঁড়ে মারলে জঙ্গ্লীদের লক্ষ্য ক'রে; তাড়াতাড়ি পলায়ন ক'রে সবাই বেঁচে গিয়েছিল, মাত্র কয়েকজন সামান্য আহত হয়েছিল।

বাক্ দেখলেন, এতে সুবিধে হবে না। তখন তিনি সহচরদের একটা কাঠের খাঁচা তৈরি করতে বললেন। তৈরি হবার পর তার মধ্যে ওরাং-ওটাংয়ের কাছে লোভনীয় একটি সুমিষ্ট রঙিন্ ফল রেখে দিয়ে খাঁচাটিকে মাটির উপর ফেলে রাখলেন। তারপর অপেক্ষা ক'রতে লাগলেন কখন্ জন্তুটি টোপ্ গেলে। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করবার পর তিনি দেখলেন প্রকাণ্ড জানোয়ারটি ক্ষিদের জ্বালায় উন্মত্ত হ'য়ে নীচের দিকে নামতে সুরু করেছে। এইখানে ফ্র্যাঙ্ক্ বাক্ ও তাঁর সাথী ছায়াচিত্র-শিল্পী আরম্যাণ্ড ডেনিস্ এক অদ্ভুত মনস্তত্বের সন্ধান পেলেন। তাঁরা দেখলেন ওরাং-ওরাংটি শত্রুদের হাত থেকে অদৃশ্য থাক্বার জন্যে একটা পাতাশুদ্ধ গাছের ডালকে সামনে রেখে ফাঁদের দিকে এগুতে লাগ্লো। দু'একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখ্লে, কিন্তু টোপের আকর্ষণে সে এত প্রলুব্ধ হ'য়েছিল যে, তাকে ধরবার জন্যে যে ফাঁদ পাতা হয়েছে, একথা সে মনে কর্তে পারেনি। ওরাং-ওটাংটা ধরা পড়লো এইভাবে।

একবার একটা প্রকাণ্ড বোড়া সাপ তাঁর একটা হাত কামড়ে ধ'রে তার দেহটা তাঁর চারদিকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করেছিল। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও বাক্ একটুও না দ'মে তাঁর চামড়ার খাপ থেকে অন্য হাতে পিস্তলটি বার ক'রে পেছন দিকে ছুঁড়তে লাগলেন। এতে সাপটির গলায় যদিও গুলি লাগলো তবু সে মর্লো না; এদিকে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ দলের সর্দ্দার আলির নেতৃত্বে এসে হাজির হ'লো। আলি তার প্রকাণ্ড কোপ-কাটা ছুরি দিয়ে সাপটার মাথা কুচি কুচি ক'রে কাটবার পর বাক্ হলেন মুক্ত। এই বোড়া সাপটি লম্বায় ছিল চব্বিশ ফিট। বোড়া সাপের বিষ নেই ব'লেই তার কামড়ে বাকের একটুখানি হাত জ্বলা ছাড়া আর কিছু হয়নি।

অনেক জন্তু ধরবার পর একদিন তিনি সেগুলো পাঠাবার বন্দোবস্ত করছেন, সেই সময়ে তাঁরই এক অনুচর একটা বাক্সের মধ্যে আবদ্ধ ক'রে একটা বড় গোখ্রো সাপকে ধ'রে আনছিল। সেটাকে তিনি জাহাজে ক'রে কোথায় পাঠাবার মনস্থ করে'ছলেন। এমন সময় হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটলো। কি ক'রে জানি না সেই সাপটি বাক্স থেকে হঠাৎ বাকের সামনে বেরিয়ে পড়ে। যে লোকটি ব'য়ে আনছিলো, সে তো এই ষোল ফিট জ্যান্ত গোখ্রো সাপকে দেখেই প্রাণভয়ে ছুট দিলে। বাক্ কিন্তু অত তাড়াতাড়ি পালাতে পারলেন না। এক কোণে তিনি তখন দাঁড়িয়েছিলেন। সাপটি সুযোগ বুঝে নিয়েছিল। এর মধ্যেই সে তাঁর দিকে এগুতে আরম্ভ ক'রেছিল। বাক্ আর একটুও ইতস্ততঃ না ক'রে নিজের মোটা খাকী জামার অনেকখানি ছিঁড়ে ফেললেন এবং সেটাকেই ষণ্ড-যোদ্ধার (Bullfighter) মত সামনে ঢালের মতন ক'রে ধরলেন। তবে শুধু পাশ কাটিয়ে যাবার জন্যে তিনি এটা ধরেন নি; তিনি প্রচণ্ডবেগে খাকী জামার ঐ অংশটুকু নিয়ে সাপের উপর লাফিয়ে পড়লেন। এবং সেটা দিয়ে সাপটির ফণার প্রায় সবটুকুই জড়িয়ে ফেললেন। জামার অংশটুকুর ভিতরে সাপটি অত্যন্ত ঝাঁকুনি দিতে আরম্ভ করলে এবং লেজ দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করতে লাগলো। তাঁর হাঁক ডাকে তখুনি তাঁর সহচরেরা বেরিয়ে এসে এই কাণ্ড দেখেই তো অবাক! তাঁর সবচেয়ে প্রিয়পাত্র আলি এগিয়ে এলো। তারপর তাঁর আদেশে সাপের মাথাটি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সুকৌশলে ধ'রে তাকে বাক্স-বন্দী করলে।

বাকের অদ্ভুত বন্য জীবন-কাহিনী এইখানেই শেষ করছি!

(মূল ইংরাজী হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনূদিত)

The Blazing Star of "Autumn Crocus"

LEDERER

STRIDES ACROSS TWO CONTINENTS TO BE A NATION'S IDOL!

Presented by the producers who discovered Katharine Hepburn.

RKO RADIO Picture

FRANCIS LEDERER and ELISSA LANDI

in

"MAN OF TWO WORLDS"

A story of barbaric love in conflict with the sugar coated morals of our strange world.

With

HENRY STEPHENSON
J. FARRELL MACDONALD

Directed by J. Walter Ruben. Merian C. Cooper, executive producer. A Pandro S. Berman production.

WATCH THE DATE

COMING SOON!

হিন্দুস্থান (সাউণ্ড) ষ্টুডিওর

সর্ব্বপ্রথম নিবেদন

হেমেন্দ্র কুমার রায়ের

(বাঙলা সবাক চিত্র)

পরিচালনা ... ... হেমচন্দ্র চন্দ্র
(শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ সরকারের সৌজন্যে)

সঙ্গীত পরিচালনা ... ... কুমার শচীন্দ্র দেববর্ম্মণ

আলোক শিল্পী ... ... দেবী ঘোষ

শব্দ নিয়ন্ত্রণ ... ... শম্ভু সিং

— শিল্পীবৃন্দ —

শ্রীমতী চন্দ্রাবতী
শ্রীমতী নিভাননী

শ্রীরাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়
শ্রীঅজিৎ ভট্টাচার্য্য
শ্রীললিত মিত্র
শ্রীসন্তোষ সিংহ
শ্রীগণেশ গোস্বামী
শ্রীনলিনী রায়

ডিষ্ট্রীবিউটার্স—

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নাচঘর

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা] Regd. No. 1304. [বার্ষিক মূল্য ২৸০ টাকা

১০ম বর্ষ
৩৮-শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
সহকারী সম্পাদক—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

৩০শে কার্ত্তিক
১৩৪১

কলালাপ

বিজয়ার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জানি জয় আমাদের হয়নি। জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে পরাজয়ের লাঞ্ছনায় বাঙালী যে আজ ম্রিয়মাণ, তাও জানি।

তবুও বলি, জয় হোক্‌

*

জয় হোক্‌ সত্যের, সুন্দরের, শিল্পের এবং শিল্পীর।

মিথ্যার প্রভাবে শিল্প আজ সঙ্কুচিত। সে প্রভাব অপসারিত হোক্‌।

"বাঙলার মেয়ে"র একটী দৃশ্যে

শ্রীনরেশ মিত্র, শ্রীমতী শান্তি ও শ্রীরতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পের রূপ যে সুন্দরতর ক'রে তুলবে, সেই শিল্পীরও জয় হোক্‌। তারও লাঞ্ছনার অবসান হোক্,নিরাশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন মন তার নবযুগের প্রভাতালোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠুক। সে পাক তার প্রাপ্য সম্মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি।

*

বিজয়া-অন্তে এই-ই আমাদের অন্তরের কামনা।

*

কিন্তু কেমন করে হবে? আমাদের সদিচ্ছার জোরে যে হবেনা, তা আমরা

সত্যই হোক্‌ শিল্পের প্রাণ। শিল্পী জানুক, বুঝুক সত্যিকারের শিল্প কি। দর্শক এবং শ্রোতা সত্যের সন্ধান পেয়ে ধারণায় আনুক শিল্পের সত্যিকারের রূপ কী মহান এবং মোহন।

*

কুৎসিৎ মনের কদর্য্য-কল্পনা শিল্পের শ্রী হরণ করে। শিল্প তা থেকে মুক্তি পায়। শিল্পের সকল প্রকাশে শ্রী ফুটে উঠুক। যা অসুন্দর, তা শিল্পের অঙ্গ থেকে অপসারিত হোক্‌। পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য নিয়ে শিল্পশতদল ফুটে উঠুক।

*

উপেক্ষিত শিল্প ফিরে পায় তার প্রতিষ্ঠা। সমাজের রসপিপাসুরা রসের সন্ধানে সমবেত হোক্‌ শিল্প মন্দিরে। শিল্পের দৈন্য দূর হোক্‌। রসধারায় অবগাহন করে বাঙালী জীবনের আনন্দ পান ক'রে মরণকে পিছিয়ে রাখুক।

*

জানি। দশ বছর ধরে এই কামনাই আমরা করে এসেচি। যেমনটি চেয়েছি, তেমনটি কোথাও পাইনি। যা পেয়েছি তাকেই পর্য্যাপ্ত বলে মনকে খুশী রাখতে পারেনি। তাই, এখনও একমাত্র ওই কামনা। জয় হোক্‌ শিল্পের এবং শিল্পীর!

*

মন যাঁদের ক্লান্ত, তাঁরা বলছেন, হবে না! এ দেশে এই-ই চলবে। যেমন আজ তেম্নি আগামী কালও এবং হয়ত পরশু ও তার পরবর্ত্তী সব কটি দিন। বিশ্বাস করি না। এ কথার মাঝে যে সত্য কোথাও আছে, তা স্বীকার করতে মন চায় না। এই দেশেই হবে।

*

বণিকের প্রাধান্য এ-দেশে হয়ত হবেনা, হয়ত যন্ত্রশিল্পও এ-দেশে খুব বড় হয়ে দেখা দেবেনা। কিন্তু যে-শিল্পের আমরা সাধক, যার প্রতিষ্ঠা আমরা কীর্ত্তি বলে মনে করি, সেই ললিত-শিল্প, মানুষের দৃষ্টিকে ঊর্দ্ধলোকে প্রসারিত করে দেবার সেই রস-সাধনা, লোকের সঙ্গে লোকান্তরের

যোগ-স্থাপনের সেই মূর্ত্ত-প্রয়াস যে অতীতে এই জাতিকেই প্রেরণা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল, বড় করে তুলেছিল তার প্রমাণ ত প্রতিদিনই আমরা পাই।

*

যদি বলা যায় সে মানুষ আর নেই, তা হলে মিথ্যা যদিও বা না বলা হয়, ভুল নিশ্চিতই বলা হবে। সেই মানুষের সেই মনই রয়েচে। হয়ত শুধু মোহাচ্ছন্ন হয়ে রয়েচে। এই মোহ থেকেইত মানুষের মনকে আমরা মুক্ত করতে চাই।

*

আমরা তাই আহ্বান করি সকল শিল্পীকে, তাঁরা সমবেত হোন্। অন্ধকারে ঘুরে বেড়াবার বদ-অভ্যেস বর্জ্জন করে সকলের মিলিত প্রয়াস দিয়ে অগ্রগমনের একটি পথ তাঁরা তৈরি করে নিন। যাকে বলে Planned Work।

*

শিল্পের সকল বিভাগেই এইভাবে কাজ সুরু হতে পারে। ধরুন নাট্য-শিল্প। শক্তিমান একদল নাট্যকার মিলিত হয়ে স্থির করুন, অন্ততঃ কয়েক বছর কাল তাঁরা কোন্ ধরণের নাটক লিখবেন। তাই স্থির করে নিয়ে তাঁরা সাধনায় লেগে যান।

*

প্রডিউসার স্থির করুন কয়েকবছর কাল তাঁদের কে কোন্ ধরণের নাটক প্রডিউস করবেন। সাফল্যের সম্ভাবনায় হাতের কাছে যা পাবেন, তাই নিয়েই যে তাঁরা মেতে উঠবেন, এ কোন কাজের কথা নয়।

•

সবাক চিত্র-শিল্প নিয়ে যাঁরা সাধনা করচেন, তাঁরাও এই ভাবে কাজ করতে পারবেন। সকলে মলে-মিশে পরামর্শ করে যদি প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করতে পারেন, তাহলে নিকৃষ্ট প্রডাকশানের প্রতিযোগিতায় তাঁদেরকে হয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবেনা। থিয়েটার এবং বায়োস্কোপ ছুটি শিল্পই এই উপায়ে শিল্পকে অনেকটা উন্নত স্তরে তুলতে পারেন।

•

কয়েক বছর এই ভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করবার পর দেখা যাবে শিল্পের ষ্টাণ্ডার্ড উঁচু হয়েচে। তখন আবার নতুন প্ল্যান এবং নতুন রকমের কাজের প্রয়োজন হবে।

*

থিয়েটারের এবং বায়োস্কোপের এ দিক দিয়ে অগ্রসর হওয়া যেমন সহজ, সঙ্গীত এবং চিত্র-শিল্পের তেমন সহজসাধ্য পথ-নির্দ্দেশ আপাতত আমরা করতে পারছি না। কেননা শেষোক্ত এই ছুটি শিল্পে যে-পরিমাণে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রভাব থাকে, পূর্ব্বোক্ত ছুটিতে সে-পরিমানে থাকে না। কাজেই ছকা প্ল্যানের ভিতর দিয়ে সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পকে এগিয়ে নেওয়া যায় কিনা, তা ভেবে দেখতে হয়; সহজ বুদ্ধিতে মনে হয়, খানিকটা যায়। এক একটা স্কুল যে গড়ে উঠেচে, তা এই রকম Schemeএর ফলেই।

•

নৃত্যশিল্প সম্বন্ধেও যে একটা Planned Seheme চলে, উদয়শঙ্করের প্রয়াসের ভিতর দিয়া তাহার আভাস পাওয়া যায়। কোথাকার কতটুকু গ্রহণ করতে হবে, কি বর্জ্জন করতে হবে, কি হবে নাচের সত্যিকারের আদর্শ, এ সম্বন্ধে Planned Scheme নিশ্চিতই চলে।

*

আমরা শিল্পি-মহলের সকলকে অবসরদের এই প্রস্তাব সম্বন্ধে ভেবে দেখতে অনুরোধ করচি। তাঁরা যদি এই কাজটি করেন, তাহলে জাতির সঙ্গে শিল্পের যোগ রক্ষা করতে পারবেন। বলাবাহুল্য যে, তাই করাই আজ প্রয়োজন। নইলে একদিন একেবারে এক-ঘরে হয়ে পড়ে থাকবার ভয় থাকেনা।

*

কলকাতার তিনটি থিয়েটারে তিনখানি নতুন নাটক খোলবার আয়োজন চলছে—নাট্যনিকেতনে, নব-নাট্যমন্দিরে এবং রঙমহলে।

*

আসচে ২৩শে নভেম্বর শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য বিরচিত 'চক্রব্যূহ' নামক পৌরাণিক নাটক নাট্যনিকেতনে প্রথম অভিনীত হবে। মনোরঞ্জন বাবুর রস-বোধের উপর আমাদের আস্থা আছে। সাধারণেরও থাকবার কথা। কেননা সত্যিকারের রসবোধ যাঁর থাকেনা, তিনি নটের খ্যাতিলাভ করতেও পারেন না। মনোরঞ্জন বাবু যে একজন শ্রেষ্ঠ নট এ-কথা আজ আর কাউকে বলে দিতে হবেনা। 'চক্রব্যূহ' নাটকের অংশ বিশেষ আমরা শুনিচি। শুনে খুশী হয়েচি। নাট্যনিকেতনের সকল শক্তিমান নট-নটী এই নাটকের নানা বিচিত্র ভূমিকায় দেখা দেবেন। প্রবোধ গুহ মহাশয়ের আয়োজনের প্রাচুর্য্যে দেখেই অনুমান করা যায়।

নাট্যনিকেতনের জয় হোক্।

*

পরদিন, শনিবার, ২৪শে নভেম্বর নব-নাট্যমন্দিরে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লিখিত 'দেশের দাবী' অভিনীত হইবে। নাটকখানি শুনচি, রাজনৈতিক। মুক্তিকামী নর-নারীর মনে আজ যে প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দিয়েচে, নাটকের রূপের ভিতর দিয়ে নাট্যকার নাকি তাই ফুটিয়ে তুলেছেন! শচীন্দ্রনাথ শক্তিমান নাট্যকার। এ নাটকেও যে তাঁর শক্তির পরিচয় পাওয়া যাবে, তা আমরা নির্ভয়ে বলতে পারি। নাটকের প্রযোজনা যিনি করচেন, শক্তির দিক দিয়ে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রযোজক। 'দেশের দাবী' প্রযোজনায় তাঁহারও উৎসাহ অনেক আশা জাগিয়ে তুলচে। সম্প্রদায়ের সকল শ্রেষ্ঠ নট-নটী 'দেশের দাবীতে' দেখা দেবেন।

*

তারপর, ডিসেম্বর মাসের বারো তারিখে রঙমহল শ্রীযুক্ত যোগেশ চৌধুরীর 'রাবণ' খুলবেন! যোগেশচন্দ্র সম্বন্ধে কাউকে কিছু নতুন করে বলতে হবেনা। তাঁর পরিচয় তার জনপ্রিয় নাটকাবলী রঙমহলের প্রযোজনা, রঙমহলের অভিনয় সবই সুন্দর এবং শোভন। পরিচালক-যুগল প্রচণ্ড উৎসাহে কাজে লেগে গেছেন!

*

মিনার্ভা 'মারাঠা-মোগল' দিয়ে আসর গরম করে রেখেচেন।

*

গ্রে ষ্ট্রীট আর সার্কুলার রোডের সংযোগ স্থলে থিয়েটার বায়োস্কোপ জগতে সুপরিচিত চানীবাবু 'মায়াপুরী' গড়ে তুলেছেন! সেখানে চলচে 'পরকীয়া' বা রামীর প্রেম-কাহিনী।